দিগন্ত

সমরেশ বসু

সমকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন
কলকাতা—৭০০০১৩

প্রথম প্রকাশ :
আশ্বিন : ১৩৭২

প্রকাশক :
প্রসূনকুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮।২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা—৭০০০১৩

প্রচ্ছদপট :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
তারা প্রিন্টার্স

Diganta
By Samaresh Basu
Price · Rs Forteen only
Published · oetober 1982

সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গেল চোখের নিমেষে। অনেকটা বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো।

শংকর বসেছিল হাইওয়ের চণ্ডীতলার মোড়ে, বটতলা ঘেঁষে, দুলালের চায়ের দোকানের বাইরের বেঞ্চিতে। রোজই বিকালে, সূর্যাস্তের আগে সে এখানে এসে বসে, চা খায়, এবং গ্রামের অন্যান্যরা যখন দোকানের ভিতরে বাইরে নানা কথা নিয়ে আসর সরগরম করে তোলে, সে বেঞ্চির এক পাশটিতে বসে, পশ্চিমের দিগন্তবিসারী মাঠের শেষে, দিকচক্রবালের দিকে তাকিয়ে সূর্যাস্ত দেখে। এই সময়টা স সব ভুলে যায় কলকাতার কথা, এই দূর গ্রাম বাসের কথা, প্রতি দিনের নানা ঘটনা, নিজের কাজকর্ম, যা নিয়ে দিনে রাত্রে নানা আলোড়ন সৃষ্টি করে, কোনো কথাই এ সময়ে মনে থাকে না। এমন দিগন্তব্যাপী মাঠ, যা আকাশের গায়ে গিয়ে মিশেছে, এবং যেখানে সূর্য ক্রমে ক্রমে একটি বিশাল লাল টকটকে গোলকের মতো, যেন দিগন্তের ভূমিশয্যার পিছনে আস্তে আস্তে ডুবে যেতে থাকে। আকাশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে রক্তের ছটা, আর পাখিরা সেই ছটার রঙ ডানায় মেখে, জোড়ায়, ঝাঁক বেঁধে অথবা একা নানা দিকে উড়ে যেতে থাকে, শংকর যেন স্পষ্ট বুঝতে পারে, পৃথিবী ক্রমাগত ঘুরে চলেছে। মনে হয়, পৃথিবীর আর কোথাও বসে এমন একটি মহিমময় দৃশ্য দেখা যাবে না। এই সময়টিতে ওর এই আটত্রিশ বছর বয়সের জীবনের যতো সুখ দুঃখ, দ্বিধা দ্বন্দ্ব, জট-জটিলতার অতীত, এক অনির্বচনীয়তায় ভরে ওঠে।

শংকর আজও সেই রকম চায়ের দোকানের বাইরের বেঞ্চিতে বসে, পশ্চিমের আকাশে তাকিয়ে সূর্যাস্ত দেখছিল। সময়টা মাঘের প্রথম দিক। সকাল থেকেই আকাশের নানা প্রান্তে টুকরো টুকরো মেঘ ছড়িয়ে ছিল। এখন সেই মেঘই যেন বিশাল এক ঝাঁক পাখির মতো, আকাশের মাঝখান থেকে, সারিবদ্ধ ভাবে একটি বিন্দুর আকারে পশ্চিমের রক্তাকাশে উধাও হয়ে চলেছে। আসলে একেই হয়তো কোদালে কুড়ুলে মেঘ বলে, এবং সেই মেঘের গায়ে রক্তের ছটা। শংকরের মনে হয়, অদৃশ্যে থেকে কোনো এক মহান শিল্পী যেন ক্রমান্বয়ে রঙের তুলি বুলিয়ে চলেছে। পাখির দল অন্যান্য দিনের মতোই, নিজেদের নিশানায় উড়ে চলেছে। আজকাল আমন ফসল কাটা হয়ে গেলেও মাঠ খা খা করে না! দিগন্ত জুড়ে রবিশস্যই কেবল না, ভিন্ন জাতের ধানের চারাও অনেক জায়গায় মাথা তুলেছে।

শংকর দেখছিল, জ্বলন্ত লাল গোলকের মতো সূর্যের নীচের অংশের রঙ যেন কিঞ্চিৎ ছায়াবৃত, ওপরের অংশটি অধিকতর উজ্জ্বল। সীমাহীন আকাশের মাঝখানে, পাখির ঝাঁকের মতো কোদালে কুড়ুলে মেঘ, প্রতি মুহূর্তে রঙ বদলাচ্ছে। এই সময়ে দূরে কোথাও থেকে একটা যান্ত্রিক গোঁ গোঁ শব্দ ভেসে আসছিল। সেটা অস্বাভাবিক কিছু না। হাইওয়ের ওপর দিয়ে লরি, ট্রাক, কলকাতার এবং আঞ্চলিক বাস, প্রাইভেট গাড়ির যাতায়াত লেগেই আছে। ও যখন তন্ময় হয়ে সূর্যাস্ত দেখতে থাকে, তখন নানা শব্দে ওর চোখের ওপর দিয়ে গাড়ি চলে গেলেও, ও ফিরে তাকায় না। তাকাবার কথা মনেও পড়ে না. কোনো কৌতূহলও নেই।

কিন্তু আজ শংকরের কী মনে হলো, ও বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে. হাইওয়ের পূব-দক্ষিণের দূরের বাঁকের দিকে তাকালো। একেই কি ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলে? কোনো কারণেই ও এ সময়ে অন্য দিকে ফিরে তাকায় না, অনেকটা ধ্যানমগ্নের মতোই সূর্যাস্ত দেখে। মুখ ফিরিয়ে ও দেখতে পেলো, একপাল ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে, একটি সাত আট বছরের ছেলে, রাস্তার উত্তর থেকে দক্ষিণে পার করে নিয়ে চলেছে। দূরে

প্রাইভেট গাড়িটা আসছে কম করে সত্তর থেকে আশি কিলোমিটার বেগে, এবং পুব দক্ষিণে বাঁক নিয়ে পশ্চিম-মুখো হয়েই, আচমকা ছাগলের পাল দেখে গতি কমাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গিয়েছে, কেন না, গতির সঙ্গে ব্রেক কষারও একটা সীমা আছে। অন্তত: নিজেকে বাঁচাবার জন্য। চালক সমানে হর্ণ দিয়ে যাচ্ছিল, যদিও ডাবল হর্ণের একটি মাত্র বাজছিল, যার জোর তেমন নেই, এবং সামনের হেডলাইট দুটো জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেটাও অর্থহীন, কারণ হেডলাইট জ্বালিয়ে যাকে সংকেত করা হচ্ছে, সাত আট বছরের রাখাল ছেলেটি তার কিছুই বোঝে না। সে হতচকিত হয়ে দেখছিল, তার ছাগলগুলি এলোমেলো ছুটোছুটি জুড়ে দিয়েছে, আর হাতের ছোট ছপটিটা নিয়ে অসহায় ভাবে, রাস্তার প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে, ছাগলের পালকে রাস্তার দু'পাশে সরিয়ে দেবার জন্য হৈ হৈ করছে।

শংকর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলো না। গাড়িটার গতি যদিও অর্ধেক হয়ে এসেছে, কিন্তু ভয়ংকর দুর্ঘটনা কিছুতেই এড়াতে পারলো না। সামান্য ডাইনে বাঁয়ে করবার চেষ্টা করেও, ছেলেটাকে সোজা এসে ধাক্কা দিল। এটা প্রায় অনিবার্য ছিল, কারণ কোনো চালকই বাঁকের মুখে গাড়ির গতির তীব্রতা কমাতে বাধ্য। তা সে কমায় নি। চালকের পা বোধ হয় এ্যাকসেলারেটরের ওপর চেপে বসেছিল। গাড়িটা একবার লাফিয়ে উঠলো যেন, এবং একেবারে থেমে গেল।

শংকর দৌড়ে এগিয়ে গেল। আশ্চর্য, ছাগলের পাল ঠিক নিজেদের বাঁচিয়ে, রাস্তার দু' পাশের ঢালুতে নেমে ম্যা ম্যা করে চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল। ছেলেটাই চাপা পড়েছে। শংকর দৌড়ে যেতে যেতে, অবাক হয়ে দেখলো, গাড়িটা হঠাৎ কিছুটা ব্যাক করলো, এবং ইঞ্জিনের শব্দেই টের পেলো চালক পালাবার জন্য, ডানদিকে বাঁক নিয়ে একেবারে ফার্স্ট গিয়ারে স্পীড তুলে এগিয়ে আসছে। শংকরের মুখ শক্ত হয়ে উঠলো। ও দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে একেবারে চলন্ত গাড়ির চালকের দরজার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে উঠলো, 'থামুন, থামুন বলছি।'

চালক এমনই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, সে ভাবতেই পারে নি, কেউ এসে তার দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আসলে সে শংকরকে লক্ষ্যই করে নি। হতচকিত হয়ে প্রথমে সে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করালো, কিন্তু কোনো চালকের মনে যদি একবার ভয় আর অপরাধ বোধ যুগপৎ জেগে ওঠে, সে তখন মরীয়া হয়ে পালাবারই চেষ্টা করে। সে ব্রেক কষলেও, গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে নি, বরং সহসা বাধা পেয়ে, সে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠলো। চকিতে দরজাটা খুলেই, সপাটে এমন ভাবে শংকরের দিকে ঠেলে দিল, দরজার ওপরের দিকটা সজোরে লাগলো ওর কপাল আর ভুরুতে। আর একটা পাশ আঘাত করলো বাঁ গালে আর চোয়ালে। দরজার নীচের দিকটা আঘাত করলো ওর পেটে কোমরে হাঁটুতে। চালক ভেবেছিল, আচমকা দরজার আঘাতেই শংকর ছিটকে পড়বে।

কিন্তু ফল হলো উলটো। আঘাত খেয়ে, শংকর আরও নির্মম হয়ে উঠলো, দরজাটা না ছেড়ে, রুদ্ধ কঠিন স্বরে বললো, 'এতো বড় সাহস, খুনের ভয় দেখাচ্ছো আমাকে?' ও হাত বাড়িয়ে চালকের হাত ধরে টানবার চেষ্টা করলো। চালক তার মধ্যেই আরও কয়েকবার, ঝটিতি দরজার ধাক্কায় শংকরকে আঘাত করলো, এবং যখন বুঝলো, শংকরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব না, তখন গাড়ি স্টার্ট করে দিল। ইতিমধ্যে গাড়ির ভিতরে কারা ছিল, শংকর লক্ষ্যই করে নি, কেবল ভয়ার্ত অস্ফুট কয়েকটি আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছিল। গাড়ি স্টার্ট দিতেই, ও মুহূর্তে, প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় স্টিয়ারিংয়ে হাত দিয়ে আপ্রাণ শক্তিতে বাঁয়ে মোচর দিতে লাগলো। তখন ওর মুখে কয়েকটা ঘুষি পড়েছে, কিন্তু গাড়ির ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ শোনা গেল, 'গাড়ি রাস্তার নীচে পড়ে যাবে।'

সেই মুহূর্তেই গাড়িটা একেবারে থেমে গেল। শংকর চালকের বুকের জামা আঁকড়ে ধরে, এক হ্যাঁচকায় রাস্তায় নামিয়ে নিয়ে এলো, এবং ওর চওড়া হাতের মুঠি পাকিয়ে ঘুষি তুলতেই, গাড়ির ভিতর থেকে একজন মহিলার আর্তনাদ ভেসে এলো, 'মারবেন না, দোহাই, আপনার পায়ে পড়ি।'

চালকও তখন দু'হাত তুলে মার বাঁচাবার চেষ্টা করছিল। শংকরের আঘাতে উদ্যত হাত নেমে গেল। ইতিমধ্যে চায়ের দোকানে এবং আশেপাশে যারা ছিল, তারা হৈ হৈ করে ছুটে এলো। শুধু হৈ হৈ করে এলো না, এলো মারমুখী হয়ে। শংকরের হাত থেকে কয়েকজন চালককে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। গাড়ির ভিতর থেকে ততক্ষণে দুজন তরুণী দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। শংকর মুহূর্তেই বুঝলো, ঘটনার গতি অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে। ও চালক যুবকটিকে দু'হাতে আড়াল করে বলে উঠলো, 'মারধোর এখন নয়, তার সময় অনেক পাওয়া যাবে। তোমরা আগে দেখ, যে ছেলেটি চাপা পড়েছে, তার কী অবস্থা। শীগ্‌গির ওকে তুলে নিয়ে এসো।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলো, 'অই গ মাষ্টের তুমার গোটা মুখখানা অক্তে ভেসে যাইচে যে?'

'সেটা পরে দেখলে হবে, আগে ছেলেটাকে নিয়ে এসো।' শংকর বললো।

আধুনিক বেশভূষায় সজ্জিত দুটি তরুণী এবং একটি বছর বারো তেরো বয়সের ছেলে তখন গাড়ি থেকে নেমে, শংকরের আড়াল করে রাখা গাড়ির চালকের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের চোখে মুখে ভয়ার্ত অসহায়তার ছাপ। চালক যুবকটি যে বেতনভোগী ড্রাইভার না, তার ফ্যাশান দুরস্ত পোশাক-আশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ডান হাতের কবজিতে দামী ঘড়ি, মণিরত্নের দুটি আংটি মধ্যমা ও অনামিকায়। অলংকার তরুণী দুটির অঙ্গে সামান্য হলেও যথেষ্ট মূল্যবান। যুবকটি এই মাঘের আসন্ন সন্ধ্যায় ঘামছে। এখন তার আর মরীয়া ভাব নেই, চোখে মুখে ত্রস্ত ভয়।

ভিড় করে আসা গ্রামবাসীরা চিৎকার করে শাসাচ্ছে, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করছে। কেউ কেউ গাড়ির গায়েই কিল চড় মারছে। ইতিমধ্যে দু-তিনজন গ্রামের বউ-ঝিও হুতোশে ছুটে এসেছে। কার ছেলে চাপা পড়েছে, সেটাই তাদের আতংকিত অনুসন্ধিৎসা। একটু দূরেই পড়ে থাকা বালকটির দিকে কয়েকজন ছুটে গেল, এবং একজন

তাকে দু' হাতে তুলে শংকরের সামনে নিয়ে এলো। বললো, মাস্টের, এ আমাদের বদি বাউরির বিটা, দেখ্যে মনে লিচ্ছে, উ বেঁচে লাই।'

সমস্ত ভিড় অচৈতন্য ছেলেটার দিকে ফিরে তাকালো। কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠলো, 'মেরে ফেলাইচে গা, ছেল্যেটার মাথা মুখ অক্কে ভেস্যে যাইচে!'

শংকর লক্ষ্য করে দেখলো, কেবল মুখ মাথা না, ধূলি ঝাড়া ছেঁড়া সামান্য বুক খোলা জামাটার ফাঁকে দেখতে পাচ্ছে, কণ্ঠার হাড় ও বুকের একদিকে ফুলে উঠেছে। বাঁ পা নিশ্চয়ই চাকার তলায় পড়েছিল, থেঁতলে গিয়েছে। চোখ বোজা হাত পা এলানো শরীরটা দেখেই, শংকরের সন্দেহ হলো, সত্যি হয় তো বেঁচে নেই! থাকাটাই আশ্চর্য কারণ যে বেগে এসে গাড়িটা ধাক্কা মেরেছে, তাতে যে-কোনো জোয়ানের পক্ষেও বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। তবু যার কোলে ছেলেটি ছিল, গায়ে শুকনো একটা গামছা জড়ানো, কোমরে জড়ানো নেংটির মতো খাটো ধুতি, গায়ে এখনো মাঠের ধুলা লাগানো, তাকে লক্ষ্য করে বললো, 'পঞ্চু, তুমি ছেলেটাকে নিয়ে গাড়ির সামনে বস। আগে আমাদের ব্লক হাসপাতালে নিয়ে চল, বেঁচে আছে না মরে গেছে, সেটা ডাক্তারবাবু দেখে বলবেন।'

কে একটি গ্রামের স্ত্রীলোক হুতোশে চিৎকার করে উঠলো, 'আর তুমারে কে দেখবে গা মাস্টের? খুনেটা যে তুমাকেও মেরে ফেলাইচে গ্য!'

মেরে না ফেললেও, শংকর মাথায় মুখে যন্ত্রণা বোধ করছিল। ইতিমধ্যেই ওর পাঞ্জাবীর বুকে, কপাল থেকে রক্তের ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করেছে। কিন্তু শংকর সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে, গাড়ির চালক যুবকটিকে গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিল, 'যান, আপনি ষ্টিয়ারিংয়ের গিয়ে বসুন। চালিয়ে নিয়ে যাবেন।'

'আর আমরা? আমরা কী করব?' একজন তরুণী আর্তস্বরে বলে উঠলো।

শংকর মুখ ফিরিয়ে এই প্রথম তরুণীদের এবং কিশোর ছেলেটির দিকে তাকালো এই মুহূর্তে কারোকেই ভালো করে দেখবার অবকাশ

নেই। শংকর কেবল দেখলো, আর্তস্বরে কথা বলে ওঠা তরুণীর সিঁথেয় সিঁদুর। অন্যটির বয়স বোধ হয় সামান্য কম, এবং সিঁথেয় সিঁদুর নেই। ও বললো, 'আপনারাও গাড়ির পিছনে বসুন, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে—'

'না, এদের সব্বাইকে আমরা ছাড়ব নাই।' শংকরের কথায় বাধা দিয়ে একজন বলে উঠলো।

শংকর মুখ ফিরিয়ে দেখলো, অঞ্চল প্রধান গুইরাম পাল কখন এসে দাঁড়িয়েছে। সে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে না চাইলেও, পুরোপুরি পারে না। তার কথা শুনে অনেকেই চিৎকার করে প্রতিধ্বনি করে উঠলো, 'না, ইয়াদের সবাইকে আমরা ছাড়ব নাই।'

শংকর গুইরামের ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবী পরা, বছর চল্লিশ বয়সের শক্ত সমর্থ চেহারার দিকে তাকিয়ে বললো, 'গুইরামবাবু এসে গেছেন, ভালোই হয়েছে। আমি এদের কারোকেই ছাড়ব না, বলতে যাচ্ছিলাম, পেছনে আমাদের লোকও ওদের সঙ্গে দু-একজন যাবেন। আপনি যখন এসে গেছেন, আপনিই চলুন। আগে আমরা হাসপাতালে যাবো। তারপরে থানায়। দুটোই কাছাকাছি।'

গুইরামের অপ্রস্তুত মুখ দেখে বোঝা গেল, শংকরের এ রকম একটা প্রস্তাব সে আশা করে নি। যারা তার সমর্থনে চিৎকার করে উঠেছিল, সবাই তার মুখের দিকে তাকালো। শংকর সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলো, 'পঞ্চ এসো, তুমি আর আমি বাউরির ছেলেকে নিয়ে সামনে বসি। চলে আসুন গুইরামবাবু, সঙ্গে কারোকে নিতে চান তো নিয়ে নিন, আর দেরি করা উচিত নয়।' ও তরুণীদের দিকে তাকিয়ে তাড়া দিল, 'নিন নিন উঠে পড়ুন, দেরী করবেন না।'

পঞ্চ বদি বাউরির ছেলের রক্তাক্ত অচৈতন্য শরীর নিয়ে শংকরের কাছে এগিয়ে গেল। শংকর গাড়ির সামনের বাঁদিকের দরজাটা খুলে ধরলো, এবং পঞ্চকে সামনের আসনে উঠতে সাহায্য করলো। চালক যুবকটি সামনের ভিড় ঠেলে ড্রাইভারের আসনে গিয়ে বসতে যেন ভরসা পাচ্ছিল না, কারণ ক্রুদ্ধ গালাগাল চিৎকার চলছিলই। শংকর ধমকে উঠলো, 'কী হলো মশাই, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? পালিয়ে যাবার

মতলবে তো খুব সাহস দেখিয়েছিলেন, এখন যে ভয়ে একেবারে জুজু হয়ে গেলেন ? যান যান, নিজের জায়গায় বসুন।'

গুইরাম পাল তখন কয়েকজনের সঙ্গে কী বলাবলি করছিল। যুবকটি ড্রাইভারের আসনে বসতে গিয়ে, দু-একজনের কনুই আর হাতের ধাক্কা খেল। একজন চেঁচিয়ে বললো, 'আমাদের বিটা যদি মরে, ত শালা তুমাকেও আমরা জ্যান্ত যেতে দিব নাই।'

ইতিমধ্যে তরুণীরা কিশোরকে নিয়ে পিছনের আসনে জড়সড় হয়ে বসেছে। গুইরাম সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পাঁচ মিনিটের রাস্তা. তোমরা সবাই চলে এসো। কার্তিক, তুমি আমার সঙ্গে ওঠ।'

কার্তিক পঞ্চায়েতের একজন সভ্য। শংকর জানে, হাসপাতালে আর থানায় গ্রামবাসীদের ভিড় করার কোনো দরকারই নেই, একমাত্র হৈ চৈ হল্লা করা ছাড়া. এখন সব থেকে বড় প্রয়োজন, ছেলেটি বেঁচে থাকলে তার চিকিৎসা শুরু করা, এবং অপরাধীকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া। গুইরাম একাই সেক্ষেত্রে যথেষ্ট। তবু অঞ্চল প্রধান হিসাবে গ্রামবাসীদের ডাকাটা বোধ হয় তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। শংকর সামনের আসনে বসে, যদি বাউরির ছেলেটির মাথা নিজের কোলে তুলে নিল। গুইরাম কার্তিককে নিয়ে পিছনের আসনে চাপাচাপি করে বসলো। যুবক গাড়ি স্টার্ট করে। আগে ব্যাক করলো, তারপরে রাস্তায় উঠে, শংকরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কোন্ দিকে যাবো ?'

'সোজা।' শংকর জবাব দিল।

গাড়িটাকে ঘিরে তখনও লোকের ভিড় আর হৈ হল্লা। যুবক হর্ণ দিল। ইতিমধ্যে গাড়ির গায়ে দুমদাম ঘুষি পড়ছিল। গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো। শংকর দেখলো, পশ্চিমের আকাশে রক্তিম ইশারা। সন্ধ্যা আসন্ন। গাড়ির পিছনে লোকজন হৈ হৈ করে ছুটে আসছে।

গাড়ি যথেষ্ট আস্তে চললেও, মিনিট তিনেকের মধ্যেই এক কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে এলো। ডানদিকে বি. ডি. ও-র অফিস

এবং কোয়ার্টার। আরও খানিকটা এগিয়ে থানাও ডানদিকে। মাঝামাঝি বাঁদিকে ব্লক ডেভলপমেন্ট স্কীমের হাসপাতাল। গেট খোলাই ছিল। তার দিয়ে ঘেরা প্রায় দেড়-দু বিঘা জমির কম্পাউণ্ডের মাধ্যই ডাক্তার নার্স এবং অন্যান্য স্টাফদের কোয়ার্টার। জন্মনিয়ন্ত্রণের বড় সাইনবোর্ড ছাড়াও, হাসপাতালের আলাদা বোর্ড রয়েছে। শংকর চিন্তিত ছিল, ডাক্তারকে পাওয়া যাবে কী না। সৌভাগ্যবশতঃ দেখা গেল, ওর থেকেও কয়েক বছরের ছোট ডাক্তার সুজিত রায় সাইকেল নিয়ে হাসপাতালের গেটের দিকে হেঁটে বেরিয়ে আসছে। শংকর গাড়ির ভিতর থেকেই ডাক্তারের দিকে হাত বের করে তুলে দেখালো, এবং চালক যুবককে বললো, 'গাড়ি ভেতরে ঢুকিয়ে একেবারে বিল্ডিংয়ের বারান্দায় কাছে নিয়ে চলুন।'

যুবক বাঁদিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে, গাড়ি ঢোকালো হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের মধ্যে। মোরাম বিছানো রাস্তা দিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো একতলা বিল্ডিংয়ের দীর্ঘ বারান্দার সামনের সিঁড়ির কাছে। ডাক্তারও সাইকেল নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলো গাড়ির কাছে। শংকর দরজা খুলে আগেই পঞ্চুর সঙ্গে ধরাধরি করে বদি বাউরির ছেলেকে নিয়ে গাড়ি থেকে বাইরে বেরোলো। সুজিত ফরসা রোগা লম্বা, গোঁফ দাড়ি কামানো পরিষ্কার বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। সাদা ট্রাউজার আর ফুল-স্লিভ সাদা শার্টের ওপর বাসন্তী রঙের হাত কাটা সোয়েটার গায়ে। বয়সের তুলনায় তার মুখ যেন বেশি গম্ভীর, বড় চোখ দুটিতে যেন কেমন বিষণ্ণতা, যা আপাত দৃষ্টিতে চোখে পড়ে না। শংকর আর পঞ্চুর হাতে বদি বাউরির ছেলেকে ও গাড়ির ভিতরে চকিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী ব্যাপার শংকরবাবু?'

'এ্যাকসিডেন্ট।' শংকর জবাব দিল, এবং পঞ্চুসহ বদি বাউরির ছেলেকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললো, 'অবস্থা বোধ হয় ভালো নয়, তাড়াতাড়ি একটু দেখতে হবে। কিন্তু আলো তো জ্বলছে না দেখছি।'

সুজিত বললো, 'ইলেকট্রিকের কথা বলছেন? সারাদিনে রাত্রে ঘণ্টা চারেকের বেশি কারেন্ট কোনো দিনই থাকে না।'

শংকরও তা জানে, যদিও গ্রামের ভিতরে ওর বাসস্থানে বিদ্যুতের কোনো ব্যবস্থা নেই। সারা গ্রামে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বাড়িতে বিদ্যুৎ আছে, এমন কি একটি বাড়িতে টেলিভিশনও আছে। কিন্তু গ্রাম যে অন্ধকারে ছিল, সেই অন্ধকারেই আছে। অধিকাংশ গ্রামবাসীর কাছে বিদ্যুৎ একান্ত বিলাসের বস্তু। যাদের আছে, তাদেরও বিজলি আলো পাখা মৃত গৃহশোভা মাত্র। কিন্তু একটা হাসপাতালের পক্ষে বিদ্যুৎ শোভা বা বিলাস না, আবশ্যিক প্রয়োজন। সারা দেশের দুর্দশার ভাগ তাকেও বহন করতে হয়, তবে তুলনা করলে, এখানে দুর্দশাটা বড় বেশি। রাত্রে কদাচিৎ আলো চোখে পড়ে।

ইতিমধ্যে গুইরাম কার্তিককে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমেছে। সুজিত সাইকেলটা বারান্দার গায়ে হেলান দিয়ে রাখতে রাখতে বললো, 'কিন্তু আপনার অবস্থাও তো ভালো দেখছি না। চলুন, এমারজেন্সি রুমের টেবিলে নিয়ে চলুন।' বাঁয়ে কোয়ার্টারের দিকে মুখ ফিরিয়ে গলা তুলে ডাকলো, 'গোলক, গোলক কোথায় গেলে? তাড়াতাড়ি এসো।'

এই সময়ে সাড়া পেয়ে, ভিতর থেকে একজন নার্স বেরিয়ে এলো। নীল পাড় সাদা শাড়ি, কালো দোহারা চেহারার বছর চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি মেয়ে। ডাক্তার তাকে দেখেই বললো, 'সিস্টার, এমারজেন্সি রুমে তাড়াতাড়ি ছোট হ্যাজাকটা নিয়ে আসুন।'

নার্স ভিতরে চলে গেল। শংকর বারান্দার বাঁদিকে যেতে যেতে, গাড়ির দিকে ফিরে, চালক যুবকটিকে বললো, 'আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন।'

যুবকটি গাড়ির স্টার্ট তখনও বন্ধ করে নি। একবার পিছনের আসনের দিকে ফিরে তাকালো। সেখানে তখন উৎকণ্ঠা আর চোখের জল মোছামুছি চলছে। যুবক দেখলো গুইরাম পাল এবং কার্তিক নামে লোক দুটি গাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। সে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দরজা খুলে নামলো। দূর থেকে গ্রামবাসীদের চিৎকার চেঁচামেচি ক্রমে এগিয়ে আসছে।

শংকর বারান্দার বাঁদিকের শেষপ্রান্তে খোলা দরজা দিয়ে, পশুর

সঙ্গে বদি বাউরির ছেলেকে নিয়ে ঢুকলো। দরজার মাথার ওপরে ইংরেজিতে লেখা, 'এমারজেন্সি'। ঘরটি প্রায় অন্ধকার, একটিমাত্র জানালা খোলা। এমারজেন্সি রুম বলতে যা বোঝায়, ঘরটিতে সে-রকম কিছুই নেই। রুগী শোয়াবার জন্য একটি উঁচু টেবিলের ওপর প্লাস্টিকের কভার। একটি বালিশ। এক পাশে একটি আলমারি। মাথার ওপরে নিশ্চল পাখা, দেওয়ালে দুটি আলোর কাচের ঝিলিক শুধু। শংকর আর পঞ্চু বদি বাউরির ছেলেকে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিল। হাসপাতালের ভিতরে যাবার একটি দরজা রয়েছে। সেই দরজা দিয়ে সুজিত ঢুকলো। পিছনে নার্সের সঙ্গে, হাফপ্যান্ট পরা, গায়ে চাদর জড়ানো খালি পা, মাঝবয়সী একজন ছোট একটি হ্যাজাক নিয়ে ঘরে ঢুকলো। যুবকটি এসে দাঁড়ালো বারান্দার দিকের দরজায়। তার পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকলো গুইরাম।

সুজিত এগিয়ে এলো টেবিলের সামনে, ঝুঁকে দেখলো বদি বাউরির ছেলের নিথর শরীর ও রক্তাক্ত মুখের দিকে। আস্তে আস্তে তার দৃষ্টি ছেলেটির মাথা থেকে, সারা গা বুলিয়ে নেমে এলো পায়ের দিকে। তার গম্ভীর মুখ থমথমিয়ে উঠলো। ছেলেটির একটি হাত তুলে একবার কব্জিতে স্পর্শ করলো। একটি চোখের পাতা খুলে একবার দেখলো, তারপর তাকালো শংকরের দিকে। স্তব্ধ ঘরে কেবল সকলের মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ। সকলের দৃষ্টি সুজিতের মুখের দিকে। সুজিত চকিতে একবার বাইরের দরজায় যুবকের দিকে দেখে, আবার শংকরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ছেলেটি মারা গেছে। গাড়ি নিশ্চয়ই বেশ স্পীডে আসছিল।'

'ই কথা আমার পেথমেই মনে হইচিল গা!' পঞ্চু আর্তস্বরে বলে উঠলো, 'মনে লিইচিল কি, উয়ার শরীলে পেরাণ নাই।'

শংকর বললো, 'আমারও তাই মনে হয়েছিল। ধাক্কা মারার সময় গাড়ির স্পীড মিনিমাম তিরিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার ছিল। ছেলেটি অনেকটা দূরে ছিটকে পড়েছিল। তারপরেও এই ভদ্রলোক—।' কথা শেষ না করে সে দরজার ওপরে যুবকের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো।

যুবক মুখ নীচু করলো। শংকর বললো, 'সুজিতবাবু, আপনি মৃত্যুর কারণ লিখে একটা সার্টিফিকেট দিন। আমরা গাড়ি নিয়ে থানায় যাচ্ছি।'

'আমার যা করবার তা আমি করছি।' সুজিত বললো, 'থানার অফিসার ঠিক করবেন, ডেডবডি ময়না তদন্তে পাঠাবেন কী না। কেসের প্রয়োজনে তা করতেই হবে বোধ হয়। কিন্তু আপনার কপাল ভুরু কাটলো কেমন করে? বাঁ গালে কালসিটে পড়ে গেছে। কী করে এমন হলো?'

শংকর এই প্রথম বাঁ গালে আলতো করে নিজের হাতে স্পর্শ করলো। অনুভব করলো চোখের নীচে হাড়ের ওপর গাল ফুলে উঠেছে। ও আর একবার দরজার ওপর যুবকের দিকে দেখে নিয়ে, একটু হেসে বললো, 'এ্যাকসিডেন্ট কেউ ইচ্ছে করে করে না, এটা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ভয় পেলে মানুষ কতোখানি অপরাধী হয়ে উঠতে পারে, সে-অভিজ্ঞতা আমার আগেও ছিল, আজ আর একবার হলো। কিন্তু ও সব কথা থাক। আমার চিকিৎসা পরে করবেন, তার আগে আমার দায়িত্বটা পালন করি। আইনের কাজটা সেরে ফেলি, গাড়ি আর তার চালককে থানায় জমা করে দিয়ে আসি।' ও আর একবার যুবকের দিকে তাকালো।

'থানায় আপনি পরে গেলেও হবে।' সুজিত শংকরের সামনে এগিয়ে এসে তার মুখের আঘাত দেখে বললো, 'অন্তত ভুরুর ওপরে একটা জায়গায় স্টিচ্ তো করতেই হবে। এ্যান্টি-টিটেনাস ইনজেকশন একটা, আর দু-একটা ওষুধও এখনই দেওয়া দরকার।' সে গুইরামের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'ওই ভদ্রলোককে আর গাড়ি নিয়ে আপনিই থানায় চলে যান। শংকরবাবুকে আমি দশ মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি।'

গুইরাম ব্যস্ত উৎসাহে বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্যানে নয়। আমিই নিয়ে যাচ্ছি থানায়।' সে দরজার দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

এই সময়ে হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে বহু লোকের চিৎকার শোনা গেল। শংকর ডাকলো, 'শুনুন গুইরামবাবু।'

গুইরাম ফিরে তাকালো। শংকর বললো, 'কাছে আসুন।'

গুইরামের মুখ দেখে বোঝা গেল, শংকরের ডাকাডাকি, কথা শোনা তার তেমন পছন্দ না। তবু এগিয়ে এলো। শংকর গলার স্বর নামিয়ে বললো, 'বাইরে লোকজন ক্ষেপে আছে। গাড়িটা ড্যামেজ করতে পারে, বা ছেলেটিকে মারধোর করতে পারে। আমি জানি, আপনার কথা সবাই শুনবে। মেয়েরাও রয়েছে গাড়ির মধ্যে, ওদের অক্ষত অবস্থায় থানায় জমা করে দিন।'

'আরে মশাই সে কথা আপনাকে বলতে লাগবে ক্যানে?' গুইরাম গেরামভারি চালে কথাটা বলে, আবার দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলে গেল, 'মাস্টেরবাবুরা সবেতেই মাস্টেরি না করে থাকতে পারে না। আইন কি আমরা কম বুঝি?' সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শংকর আর সুজিত একবার চোখাচোখি করলো। শংকরের ঠোঁটে বিমর্ষ হাসি ফুটলো। কিন্তু সুজিতের মুখ গম্ভীর হলো। ও নার্সের দিকে ফিরে বললো, 'সিস্টার, আপনি স্টিচ ইনজেকসান সব নিয়ে আমার ঘরে যান। হ্যারিকেনের আলোতেই আমি শংকরবাবুকে দেখবো। গোলক, তুমি এ ঘরে থাকো আর তোমার কী নাম যেন?'

'পঞ্চু।' শংকর বললো।

সুজিত বললো, 'তুমিও একটু থাকো। আসুন শংকরবাবু।'

পঞ্চু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'থাইকব গ্য বাবু, থাইকব। কিন্তুক বদি বাউরির বউটার, বদি নাই, বেধবা মেয়্যামানুষটার ইটি বড় বিটা ছিল। ধান পান দুটা পয়সা ই বিটাই ওজগার কইরত, এখন কী হবেক গ্য?'

গোলক বললো, 'হুঁ হুঁ পঞ্চু, ই ত কপালের লিখন হে, ই কেউ খণ্ডাতে পারে নাই।'

শংকর আর একবার বদি বাউরির মৃত ছেলেটির রক্তাক্ত মুখের দিকে তাকালো। কিছুক্ষণ আগেও টগবগে জীবন্ত ছেলেটা জাতীয় সড়কের ওপরে, অসহায় হুতোশে বিভ্রান্ত পশুগুলোকে লাঠি তাড়া করে, গাড়ি চাপা পড়া থেকে বাঁচাতে ছুটোছুটি করছিল। কিন্তু বলি হয়েছে ও নিজেই। মানুষ যুক্তিতে বিশ্বাসী, শংকরও। তবু অমোঘ

দৈব যেন সব যুক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ও সুজিতকে অনুসরণ করতে করতে শুনতে পায়, বাইরের লোকজনের হৈ চৈ-এর মধ্যে গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ। গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে গেটের দিকে।

শংকর ভিতরে যাবার দরজা দিয়ে ঢুকলো। হাসপাতাল ওর অচেনা না। এমারজেন্সি রুমের বাইরেই এক ফালি সরু করিডর। বাঁদিকের ঘরটি হাসপাতালের ও-টি। এবং তা নামে মাত্রই। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত তো দূরের কথা, অক্সিজেন দেবারও ব্যবস্থা নেই। একটা অক্সিজেন সিলিণ্ডার পুরনো হয়ে অনেক দিন পড়ে আছে। অপারেশনের যন্ত্রপাতির অভাব, প্রয়োজনীয় ওষুধও সব সময়ে থাকে না। চার বিছানার একটি ওয়ার্ড, তুলনায় রুগীর সংখ্যা অনেক বেশি। মেঝের ওপরেও রুগীদের থাকবার ব্যবস্থা করতেই হয়। কোন্ রুগী হাসপাতালে জায়গা পাবে না পাবে, সেটাও তাদের ভাগ্যের লিখন কারণ, দলাদলি।

শংকর ও-টি পরে পাশাপাশি আর একটি দরজা বন্ধ ঘর পেরিয়ে. মুখোমুখি আর একটি ঘরের সম্মুখীন হলো, ভিতরে আলো জ্বলছে সুজিতের ঘর। ডাক্তারের খাস চেম্বার যাকে বলে। সুজিত দাঁড়িয়ে ছিল দরজার পাশেই। ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, 'আসুন।'

শংকর ভিতরে ঢুকলো। ডাক্তারের খাস চেম্বার বলতে, একটি সানমাইকার টেবিল, টেবিলের ওপর এক পাশে কিছু কাগজপত্র, কলমদান, টেবিল-ল্যাম্পের শোভা। ডাক্তারের নিজের চেয়ার ছাড়া. আরও তিনটে চেয়ার মুখোমুখি। দেওয়ালে একটি ইংরেজি ক্যালেণ্ডার। দেওয়ালের গায়ে একটি কাচের পাল্লা দেওয়া দেয়াল আলমারি, তার তাকের ওপর রয়েছে কয়েকটি শিশি বোতল কৌটো। আপাততঃ টেবিলের ওপর জ্বলছে একটি হ্যারিকেন।

সুজিত না বসে আবার দরজার দিকে যেতে যেতে বললো, 'বসুন শংকরবাবু। আমি দেখছি, সিস্টার সব নিয়ে আসছে কী না।'

সুজিতের কথা শেষ হওয়ার আগেই, করিডরে নার্সের গলা শোনা গেল, 'আমি এসে গেছি।'

শংকর এতক্ষণে অবকাশ পেলো, পকেট থেকে, সস্তা ভাজা তামাকের সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করার। কিন্তু বাধা দিল সুজিত। সে টেবিলের কাছে সরে এসে বললো, 'সিগারেট পরে ধরাবেন শংকরবাবু, আগে আমার কাজটা করে নিই।'

নার্স ঘরে ঢুকলো একটা বড় ব্যাগ নিয়ে। টেবিলের ওপরে ব্যাগ রেখে তার মুখ খুললো। সুজিত হ্যারিকেনটা উঁচু করে তুলে ধরলো। নার্স একটা বড় ইথারের শিশি আর তুলো বের করে, আগে তুলো ইথারে ভিজিয়ে সুজিতের হাতে দিল। সুজিত হ্যারিকেনটা টেবিলে রেখে, ইথারে ভেজানো তুলো দিয়ে শংকরের কপাল, ভুরুর ওপরের ক্ষতে, আল্‌তো করে রক্ত মুছতে মুছতে বললো, 'ধাক্কা লাগলো ছেলেটির, কিন্তু আপনার এ রকম লাগলো কী করে, সে-কথাটা কিন্তু পরিষ্কার হলো না। বাঁদিকের ভুরুর ওপরটা তো চামড়া ফেটে গেছে। ডানদিকেরটা ততোখানি নয়। কপালের ওপরেও দেড় ইঞ্চির মতো কেটে গেছে।'

শংকর কিছু না বলে হাসলো। ওর টেবিলের ওপর রাখা হাতে দেশলাই আর সিগারেটের প্যাকেট। ইথারের কয়েক ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো ওর উন্নত নাকে আর চিবুকে। চোখ বুজে বললো, 'বলবো পরে।'

সুজিত নার্সের দিকে ফিরলো। নার্স হাতে স্টিচের নিডলে সুতো পরিয়ে প্রস্তুত। সুজিত, নিজের হাতে সেটা নিয়ে বললো, 'আপনি একটু হ্যারিকেনটা তুলে ধরুন সিস্টার।' সে শংকরের মাথাটা চেয়ারের পিছনে ঠেকিয়ে দিয়ে বললো, 'মাথাটা এ ভাবে রাখুন, একটু লাগবে, সহ্য করতে হবে। পারবেন না?'

'পারবো।' শংকর বললো।

সুজিত দ্রুত হাতে আগে কপালে এবং পরে বাঁ ভুরুর ওপরে স্টিচ করলো! শংকর ঠোঁটে ঠোঁট টিপে রইলো। তেমন কিছু যন্ত্রণাবোধ করলো না। ছুঁচ ফোঁড় দেবার সময় যা একটু লাগছিল। কিন্তু সুজিতের দুরন্ত হাতে সেলাই হয়ে গেল যেন নিমেষে। সেলাইয়ের পরেই, ক্ষতে ওষুধ লাগিয়ে, তুলো চাপা দিয়ে, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল

কপাল থেকে মাথার পিছন থেকে জড়িয়ে। নার্স মেয়েটি এক হাতে হ্যারিকেন ধরে, অন্য হাতে সব যোগাড় দিল। শংকরের চেহারাটা গেল বদলে। ও ব্যাণ্ডেজের ওপর একবার হাত দিয়ে দেখে বললো, 'মাথার পেছনে চুল শুদ্ধ ঢাকা পড়ে গেল। কতোদিন এ ব্যাণ্ডেজ রাখতে হবে?'

'আপাততঃ তিন দিন এ ব্যাণ্ডেজ খোলা চলবে না।' সুজিত ইথারে তুলো ভিজিয়ে শংকরের বাঁদিকের গাল মুছতে মুছতে বললো, 'আর এ তিন দিন জল লাগানো চলবে না।' ইথারের তুলো রেখে সে নার্সের হাত থেকে মারকিউরোক্রমের শিশি নিয়ে, তুলোতে ভিজিয়ে, গালে লাগিয়ে দিল।

শংকর বললো, 'সর্বনাশ! বলেন কী? তিন দিন চান করতে পারবো না?'

'গা ধুতে পারবেন, মাথায় জল ঢালতে পারবেন না।' সুজিত এই প্রথম হাসলো, বললো, 'তবে যদি বোধ করেন, মাথা খুব গরম হয়ে গেছে, তবে ভেজা তোয়ালে বা গামছা দিয়ে, মাথাটা মুছে ফেলবেন।'

'মাথা আমার খুব গরম নয় ডাক্তারবাবু।' শংকর হেসে বললো, 'রোজ স্নানের অভ্যাস, অস্বস্তি হবে।'

'তা হবে।' সুজিত বললো, 'কিন্তু উপায় নেই। জল লাগলে সেপটিকের ভয় আছে। তিন দিনের পরও কয়েকদিন যাতে জল না লাগে, তা ও দেখতে হবে। তিন দিন পরে ব্যাণ্ডেল খুলে নতুন করে ড্রেস করতে হবে। প্রথমে এক দিন অন্তর, তারপরে রোজ কয়েক দিন। ধরে নিন দু' সপ্তাহের ধাক্কা।' সে নার্সের দিকে ফিরলো।

নার্সের হাতে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ধরাই ছিল। সুজিত সিরিঞ্জ নিয়ে বললো, 'আপনার পাঞ্জাবীর হাতটা গোটাতে হবে।'

শংকর সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই টেবিলে রেখে, বাঁ হাতের মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে অনেকখানি তুলে, ডানা এগিয়ে দিল। সুজিত বাঁ হাতে ইথারের তুলো দিয়ে ডানা মুছে, ইনজেকশান দিল। নার্সের দিকে সিরিঞ্জ বাড়িয়ে দিয়ে বললো,

'আপনি এবার তুলো-টুলোগুলো তুলে সব গুছিয়ে নিয়ে চলে যান। ওষুধ আমি দিচ্ছি, আপনি এক গেলাস জল দিয়ে যাবেন।'

নার্স মাথা ঝাঁকিয়ে, নির্দেশ অনুযায়ী সব গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল। সুজিত বললো, 'আপনার শরীরের আর কোথাও লাগে নি তো? ঠিক জানেন?'

শংকরের তলপেট এবং উরুতে সামান্য ব্যথা করছিল। কিন্তু ও বললো, 'না সে-রকম কিছু লাগেনি।'

'তা হলে এবার সিগারেট ধরিয়ে বলুন তো, আপনার মুখে এ রকম চোট লাগলো কেমন করে?' সুজিত ঘরের দেওয়াল আলমারির কাঁচের পাল্লা খুললো, কিন্তু মুখ ফেরানো শংকরের দিকে।

শংকর সিগারেট ধরিয়ে, একটি দীর্ঘ টান দিয়ে, ধোঁয়া ছাড়লো।

সুজিত বললো, 'এক মিনিট, আমি ওষুধগুলো বের করি আগে।'

শংকর বললো, 'আপনাকে তো তখনই বলেছিলাম, দুর্ঘটনার জন্য কে কতোটা দায়ী, তা বিবেচ্য কিন্তু দুর্ঘটনার পরে কেউ যদি অপরাধ-প্রবণ হয়ে ওঠে, সে যে কী করতে পারে না পারে, সে নিজেও বোধ হয় জানে না।'

সুজিত রাংতায় মোড়া কিছু ওষুধ নিয়ে টেবিলের সামনে ওর নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলো, জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো শংকরের দিকে। শংকর সিগারেটে টান দিয়ে, এ্যাকসিডেন্ট এবং তার পরবর্তী ঘটনা সুজিতকে বললো। কথাগুলো শুনতে শুনতে, সুজিতের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু চোখে উৎকণ্ঠিত বিস্ময়। বললো, 'তার মানে, আপনি স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিতে না পারলে, ও হয় তো আপনাকেও চাকার তলায় পিষে দিয়ে যেতে পারতো।'

'তা চলন্ত অবস্থায় আমি যদি ছিটকে পড়তাম, পেছনের চাকার তলায় হয় তো চলে যেতাম।' শংকর হাসলো।

সুজিত প্রায় ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে বললো, 'আপনি হাসছেন? ভদ্রবেশী লোকটা তো একটা জঘন্য ক্রিমিনাল বলে মনে হচ্ছে। তার হাতে কোনো অস্ত্র থাকলে, তা দিয়েই হয়তো আপনাকে সাবাড় করে দিয়ে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যেতো।'

'তা হয়তো পারতো।' শংকর ওর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হেসে বললো, 'অবস্থা বিপাকে, কে যে কী ক্রাইম করতে পারে, ক্রিমিনাল নিজেও তা জানে না।'

সুজিত জোরে মাথা নেড়ে বললো, 'না না শংকরবাবু, এ ক্ষেত্রে আপনার এ রকম সিনিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি আমি মেনে নিতে পারছি না। এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। আপনি না বললেও, আমিই থানায় এ ঘটনা বলবো।'

'কী দরকার ডাক্তারবাবু? শাস্তি তো ওর এমনিতেই হবে।' শংকর শান্ত স্বরে বললো।

সুজিত কিছু বলতে যাচ্ছিল। নার্স কাঁচের গেলাসে জল নিয়ে ঢুকলো। গেলাস টেবিলে রেখে, জিজ্ঞেস করলো, 'আর কিছু দিতে হবে?'

'না, আপনি ওয়ার্ডে যান।' সুজিত রাংতার মোড়ক ছিঁড়ে ওষুধ বের করতে করতে বললো।

নার্স চলে যাবার আগে একবার শংকরের দিকে দেখলো। সুজিত দু'রকমের তিনটি বড়ি দিয়ে বললো, 'এগুলো খেয়ে ফেলুন, আর বাকিগুলো নিয়ে যান। আজ রাত্রে শোবার আগে তিনটি বড়ি খাবেন। কাল থেকে দিনে তিনবার এই ওষুধই চলবে। ফুরিয়ে গেলে আর দিতে পারবো কী না বলতে পারি না, আপনাকে বিষ্ণুপুর থেকে আনিয়ে নিতে হবে। আমি প্রেসক্রুপশন লিখে দেবো। আর তিন দিন পরে ইস্কুলে যাবার আগে সকালবেলা আমার এখানে আসবেন, আমিই ড্রেস করে দেবো।'

শংকর গেলাস তুলে গলায় জল ঢেলে, বড়ি তিনটি মুখে ফেলে একসঙ্গে গিলে ফেললো। বাকি জলটুকুও চুমুক দিয়ে শেষ করলো। সুজিত আবার কিছু বলবার উদ্যোগ করতেই, বাইরে থেকে স্ত্রী-স্বরের আর্তকান্না ভেসে এলো, 'অ আমার বুধাই, তোকে কোন্ যমে খেয়্যা লিল র‍্যা···অ আমার বুধাই কুথায় গ্য।'

'বদির বউ এসেছে।' শংকর উঠে দাঁড়ালো, 'আমি যাই।'

সুজিত চেয়ার ছেড়ে উঠে বললো, 'চলুন, আমিও যাই। আপনি

ওষুষগুলো পকেটে নিন।'

শংকর ওষুধ পকেটে পুরে ঘরের বাইরে গেল। এমারজেন্সি রুমের ছোট হ্যাজাকের আলোরই সামান্য রেশ করিডরের অন্ধকার অনেকটা লঘু করে দিয়েছে। শংকর সেই আলোয় এমারজেন্সি রুমে ঢুকে দেখল, বদির বউ টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে, দু' হাতে বুধাইকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদছে। গোলক সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে, 'অই, শুন গ্য বদির বউ, কাঁদিস নাই।'

বুধাইয়ের রক্ত শুকিয়ে যাওয়া মুখে, সারা গায়ে নিজের মুখ ঘষতে ঘষতে বদির বউ কেঁদে বললো, 'আমি পোড়াকপালি রাড়ি মাগী, বুধাই, আমার বড় বিটা গ্য, উ যে আমার সব ভরসা ছিল গ্য। উয়াকে ক্যানে যম কেড়্যে লিল···।' সে বুধাইয়ের মুখটা বুকের কাছে তুলে চিৎকার করে ডাকলো, 'অ বাপ্ বুধাই, একবার চখ মেল্যে দেখবি নাই, নাই কি র‍্যা? মা বুল্যে আর ডাকবি নাই, নাই কি র‍্যা?'

শংকর কী বলবে, ভেবে পাচ্ছে না। বদির বউকে সে চেনে। একই গাঁয়ের, দক্ষিণে বাউরিপাড়ার বউ। সারা গায়ে হাতে মাঠের ধূলা, গায়ে শুকনো কাদার দাগ। খবর পেয়ে ছুটে এসেছে। অভাব অনটনের মধ্যেও, বদির বউয়ের খেটে খাওয়া শরীরে এখনও স্বাস্থ্যের দীপ্তি আছে। ভাসা চোখ বোঁচা নাক মুখে একটা শ্রী আছে। বয়সও বেশি না, পঁচিশ ছাব্বিশ হতে পারে। শংকরের সঙ্গে পথে-ঘাটে দেখা হলে, ছেঁড়া খাটো ময়লা শাড়ির আঁচল টেনে ঘোমটা টানবার অনর্থক চেষ্টা করে, হেসে বলে, 'গড় করি গ্য মাস্টেরবাবুর।' জবাবে শংকরের সামান্য কুশল জিজ্ঞাসা, 'ভালো আছো?' বদির বউয়ের জবাব, 'আমাদিগের আর ভাল মন্দ, চল্যে যাইচে।'···এ পর্যন্তই। কিন্তু দুর্ঘটনায় সদ্যমৃত পুত্রের মাকে কী বলে সান্ত্বনা দেওয়া যায়, শংকরের তা জানা নেই। তার বুকের কাছে নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছে, একটা অসহায় কষ্ট ছাড়া আর কোনো অনুভূতি নেই। ও সুজিতের মুখের দিকে তাকালো।

পঞ্চু ডেকে বললো, 'আই গ বদির বউ, মাস্টেরবাবু আইচেন।'

'কই কুথায় ?' বদির বউ ছেলের মাথা টেবিলে রেখে মুখ তুললো, আর শংকরকে দেখে, টেবিলের পাশ দিয়ে ছুটে এসে হাঁটু পেতে পায়ের কাছে বসে, দু'হাত তুলে হাহা স্বরে কেঁদে উঠলো, বললো, 'অই মাষ্টেরবাবু, আমি শুনিচি, তুমি গাড়িঅলাকে ধরেছ। কিন্তু আমার কী হবেক গ মাষ্টেরবাবু। গাড়িঅলা কি আমার বুধাইয়ের পেরাণটা ফিরাই দিবেক ?'

পঞ্চু এগিয়ে এসে বললো, 'অ বদির বউ, শুন ক্যানে।'

'কী শুনব গ, আঁা, কী শুনব ?' বদির বউ বুক চাপড়ে বললো, 'বুধাই আমার বড় বিটা, ছোট বিটা বিটি দুটা খালায়েক কুরাগুড়া। বুধাইয়ের মুখ চেয়্যে আমি কারুক্কে সাঙা করি নাই, বাবুদিগের সঙ্গে নাঙিন করি নাই। কত্ত ফোঁসলানি, ফিসফাস গুজগুজ, কুন কথায় কান দিই নাই। ক্যানে ? না আমার বুধাই মরদ হচ্ছে, উ সম্সার দেখবেক। হা আমার পেত্যয় গ...।' কান্নায় তার কথা ভেসে গেল। মাথা নীচু করে মেঝেতে ঠুকলো।

শংকর অসহায় ব্যাকুল চোখে পঞ্চু আর গোলকের দিকে তাকালো। ও জানে, বদির যুবতী বিধবা একটি কথাও মিথ্যা বলে নি। সাঙা তাকে কেউ কেউ করতে চেয়েছিল। তার ফলে সন্তানদের অযত্ন হবে, সেই ভয়ে বিয়ে করে নি। বাবুদের লোভের হাতছানিতে সে ভোলে নি, নষ্ট হয় নি, একমাত্র বুধাইয়ের বড় হবার ভরসায়। পঞ্চু এগিয়ে এসে বদির বউয়ের মাথাটা চেপে ধরে তাকে তুলে বসালো। এত সহবত জ্ঞান, এখন বুকের কাপড় খসে পড়ে, মায়ের বুক জোড়া উদাস। পঞ্চু বললো, 'অই গ বদির বউ শুন, এমন কর‍্যে কপাল ঠুইকলে কি তুমার বুধাইকে ফিরে পাবে ? নিজের শরীলটাকে ক্যানে ভাঙচুর কর।'

বদির বউয়ের চুল খোলা। মাথাটা ওপর দিকে তুলে, চোখ বুজে ঘাড় নাড়তে লাগলো। চোখে জলের ধারা।

সুজিত বললো, 'ভাবছো কেন, যে চাপা দিয়েছে, সে তো ধরা পড়েছে। বিচার একটা হবেই।'

'আর কী বিচার হবেক গ বাবু।' বদির বউ উঠে দাঁড়িয়ে বুক

ঢাকলো, টেবিলের উপর শোওয়ানো বুধাইয়ের গায়ে হাত রেখে, মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ভগমানের বিচার হেথা শুয়্যে রইচে। আ…! কী তুমার বিচার গ, বুইতে লারলাম। বুধাই র‍্যা!' সে বুধাইয়ের বুকে মুখ রাখলো।

শংকর সুজিতের মুখের দিকে একবার দেখে, মাথা নীচু করে ঘরের বাইরে এলো। হাসপাতালের বারান্দা থেকে নেমে, খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ালো। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। এ সময়ে শংকরের বাইরে থাকবার কথা না। সূর্যাস্তের পরেই ও প্রতিদিনের মতো ফিরে যেতো নিজের ঘরে। গায়ের চাদরটা জড়িয়ে আবার বেরিয়ে পড়তো পশ্চিমপাড়ায়, ছাত্র পড়াতে। ছাত্র পড়ানোটা তার রুজির কারণে না, একা হাতে ঘরকন্না করতে সে অসমর্থ। ইস্কুলের শিক্ষক হিসাবে, সময় ওর হাতে থাকে, কিন্তু জীবনে একটা কাজ ওর দ্বারা কখনো সম্ভব হয় নি। নিজের হাতে রান্না করে খাওয়া। সবাই সব পারে না। খুঁজলে, রান্নার লোক হয়তো গ্রামে খুঁজে পাওয়া যেতো। তার ঝামেলাও কম না। ওর মতো একলা মানুষের পক্ষে ঝাড়া হাত পা হওয়া যায় না। সেটাও এক রকমের সংসার পেতে বসার মতো। একজনের ওপর সব দায়িত্ব দিয়েও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। গ্রামে শহরের মতো হোটেল কেউ আশা করতে পারে না। সেই কারণেই, সকালে রাত্রে, দুটি বাড়িতে ও ছাত্র পড়ায়, প্রতিদানে, নগদ মূল্যের বদলে, দুপুরে রাত্রে আহারের ব্যবস্থা। গ্রামে এ রকম সুযোগ পাওয়াও এক রকম ভাগ্যের কথা। যদিও ভাগ্যের দরজাটা সহজে খোলে নি, কারণ গ্রামীণ জীবনের ক্ষেত্রে এ রকম ব্যবস্থার প্রচলন, বলতে গেলে কোথাও বিশেষ দেখা যায় না। এবং যে-কোনো দিনই এ ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ে পড়তেও পারে। বাইরে থেকে গ্রামের জীবনযাত্রাকে যতোটা সহজ দেখায়, আদৌ তেমন সহজ না।

যাই হোক, শংকর বাইরে বেরিয়ে এই মুহূর্তে একটি মাত্র জামা গায়ে থাকলেও, শীত বোধ করছে না। সেটা ওর আটত্রিশ বছর বয়সের উত্তাপ বা ঋজু দীর্ঘ শরীরের জন্য না। দুর্ঘটনার আকস্মিকতা ও বুধাইয়ের মৃত্যুর আঘাত ও সহজ ভাবে নেবার চেষ্টা করলেও, বদির

বউয়ের কান্না ওকে জীবনের নতুন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। বিশেষ করে, বুধাইয়ের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে তার শেষ কথাটা ওর মস্তিষ্কের কোষে কোষে বাজছে, 'ভগমানের বিচার হেথা শুয়ে রইচে। আ!···কী তুমার বিচার গ, বুইতে লারলাম।'···তা ছাড়াও দুর্ভাগা বাউরি বিধবাটি যে-কয়টি কথা বলেছে, তার মধ্যে ফুটে উঠেছে, একটি অসহায় রমণীর নির্মম জীবনের সারাৎসার। তার জীবনের এই পরিপ্রেক্ষিতে, কে কোন্ অভয়বাণী শোনাতে পারে?

শংকর ওর কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখটা আকাশের দিকে তুললো। কুয়াশা নেই, ইতিমধ্যেই অজস্র তারার বিন্দু ঝিকমিক করছে। সেই ঝিকিমিকি তারায় তারায় কেবল একটা রহস্যের হাসি, এই পৃথিবী নামক গ্রহের, কোনো এক বিধবা বাউরি বউয়ের জিজ্ঞাসার কোনো জবাব নেই। যেন চিরকাল ধরেই সীমাহীন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘুরপাক খেতে খেতে, একই নির্বাক রহস্যের হাসি হেসে চলেছে। তথাপি মানুষ নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে কোনো জবাবের প্রত্যাশা করে না, তার নিজের জীবন থেকেই সে জবাব খুঁজে নিতে চায়। হয়তো বদির বিধবাও নিজের জিজ্ঞাসার জবাব নিজেই খুঁজে নেবে। সংসারের এটাই নিয়ম।

শংকরের গায়ের ওপর টর্চের আলো পড়লো। সুজিতের গলা শোনা গেল, 'শংকরবাবু? আমি ভাবলাম, আমার দেরী দেখে, আপনি বোধ হয় থানায় চলে গেছেন।'

'না, যাই নি, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।' শংকর মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল। সুজিতের হাতের টর্চের আলো সাইকেলের সামনে বেতের ঝুড়িতে পড়লো, কিছু দেখলো। তারপর টর্চের আলো নীচে নামিয়ে, সাইকেল নিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বললো, 'টর্চ আর হসপিটালের লেটার প্যাডটা আনতে গিয়ে একটু দেরী হয়ে গেল। চলুন।'

শংকর টর্চের আলোয় সুজিতের পাশাপাশি চলতে চলতে হেসে

বললো, 'ডাক্তারবাবু, আমার কথা শুনে তখন বলছিলেন, আমার সিনিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি আপনি মেনে নিতে পারছেন না। বদির বউ আপনার বিচারের জবাবে মরা ছেলেকে দেখিয়ে বললো, ভগবানের বিচার তার সামনে পড়ে রয়েছে। তার কী জবাব দেবেন ?'

সুজিত বললো, 'শংকরবাবু, আপনি সমস্ত ব্যাপারকে এক রকমের দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখছেন। হয়তো বদির বউয়ের কথা খুবই সত্যি। ছেলেই যখন মরে গেল, তখন আর কিসের বিচার ? কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কি আমরা চলতে পারি ? আমরা চাই অপরাধের বিচার হবে, অপরাধী শাস্তি পাবে। আপনিও কি তাই চান না ?'

'নিশ্চয়ই চাই।' শংকর বললো, 'অপরাধ, বিচার, শাস্তি, এ সব তো আমাদের জীবন ধারণের আবিশ্যিক ব্যাপার। তার ওপরেও বোধ হয় কিছু আছে, যেখানে আমরা অসহায়। অবিশ্যি তা বলে আমি হাত পা গুটিয়ে থাকতে বলছি না।'

সুজিত বললো, 'আমিও সে-কথাই বলছি। আমি মশাই ডাক্তারি করি। যদি ধরে নিই, ধন্বন্তরি ওঝা বলে কেউ সত্যি ছিল, তাকেও কিন্তু বস্তুর সাহায্য নিতেই হয়েছিল। মন্ত্রে তন্ত্রে ব্যাধি সারে না। তেমনি সভ্য সমাজে বাস করতে গেলে, আমরা যে কোনো ব্যাপারেই একটা ব্যবস্থা না নিয়ে পারি না। সে-ব্যবস্থার ফলাফল যা-ই হোক। অবিশ্যি কথাগুলো আপনাকে বলার কোনো মানে হয় না, নিজেরই কানে কেমন বক্তৃতার মতো লাগছে।'

'আপনার সঙ্গে আমার মতবিরোধ কিছু নেই।' শংকর হাসলো, বললো, 'কোনো কারণেই আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারি না। ওটা তো আমাদের স্ব-ভাবের মধ্যেই রয়েছে। তবু আপনার কথাটাই আপনাকে শোনাচ্ছি, কোনো ব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই।'

হাসপাতালের গেটের বাইরে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই পশ্চিমের দূর থেকে হেডলাইটের আলো পড়লো ওদের গায়ে। শংকর আর সুজিত দুজনেই দাঁড়ালো। আলো দুটো দেখলেই বোঝা যায়, ট্রাক অথবা বাস আসছে। বাস হলে থানার কাছাকাছি দাঁড়াবে।

সুজিত বললো, 'আপনার কথা আমি বুঝেছি। তবু বলি, একজন রুগীকে যখন চিকিৎসা করি, তখন কিন্তু বাঁচিয়ে বা সারিয়ে তোলার ফলাফলেই বিশ্বাস করি।'

'তা নইলে তো আপনার চিকিৎসা করাই চলে না।' শংকর বললো, 'হয় তো আমার কথাও বক্তৃতার মতো শোনাবে, তবু বলছি, আশা না থাকলে, কিসের জোরেই বা কোনো কাজ করা যায়? মানুষ তো নিয়মিত হাতের খেলার পুতুল নয়।'

সুজিত ওর বাঁ পাশে শংকরের মুখের দিকে তাকালো। শংকরের মুখে, ক্রমাগত এগিয়ে আসা গাড়ির হেডলাইটের আলো। ওর ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা। সুজিতের চোখে কেমন সংশয় ও সন্দেহ জাগলো। শংকর মুখ ফিরিয়ে সুজিতের মুখের দিকে দেখলো। সুজিতের চোখে সন্দেহের ছায়া দেখতে পেলো। কিছু বললো না, কেবল ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসিটুকু গোপন করার চেষ্টা করলো। অন্ধকার ভেদ করে হেডলাইট দুটো দ্রুত এগিয়ে এলো, এবং থানার সামনে না দাঁড়িয়ে, ঝড়ের বেগে শংকর সুজিতের গায়ে বাতাসের ঝাপটা দিয়ে চলে গেল। অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে উঠলো। সুজিত হাতের টর্চলাইট জ্বাললো। মাঘের ঝরা শুকনো পাতার খড়খড় আওয়াজ। টর্চের আলো পিচের রাস্তার ওপর পড়লো। দুজনেই বড় রাস্তায় উঠে, পশ্চিম দিকে এগিয়ে চললো। একটু দূরেই ডানদিকে থানার ঘরে হ্যাজাকের আলোর রেশ বাইরে দেখা যাচ্ছে। সুজিত যেন আপন মনে উচ্চারণ করলো, 'আপনার শেষের কথাটা মনের মধ্যে কেমন একটা খটকা ধরিয়ে দিল।'

'কিসের খটকা?'

'তা বলতে পারিনে। আপনি কি নিজে সত্যি বিশ্বাস করেন, মানুষ নিয়তির হাতের খেলার পুতুল নয়?'

এখন শংকরের মুখে আলো নেই। ওর ঠোঁটে আবার হাসি ফুটলো। ওর মনে হয়েছিল, সুজিত এ রকম কিছু জিজ্ঞেস করবে। সুজিতের চোখে সন্দেহের ছায়া দেখেই কথাটা মনে হয়েছিল। ও বললো, 'বিশ্বাস করতে চেষ্টা করি। তা নইলে কোন্ তাগিদে কলকাতা

ছেড়ে এই গ্রামে এসে পড়ে আছি, বলুন !'

সুজিত বললো, 'তাই কি শংকরবাবু ? আমার তো ধারণা, আপনি এখানে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়ে পড়ে আছেন।'

'আর আপনি কি এখানে অনিচ্ছায় নির্বাসিত হয়ে পড়ে আছেন ?' শংকর হেসে জিজ্ঞেস করলো।

সুজিত দাঁড়িয়ে পড়ে, শংকরের গলার কাছে টর্চের আলো ফেললো। ওর মুখ স্পষ্ট দেখা গেল। ওর ঠোঁটে হাসি। এখন টর্চের আলোয় চোখ দুটো লাল দেখাচ্ছে। শংকরও সুজিতের মুখ অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। বেশ কয়েক মুহূর্ত দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখলো, তারপরে দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলো। সুজিত টর্চের আলো নীচু করলো, বললো, 'শংকরবাবু, আপনাকে এক বছরের ওপর দেখছি, কিন্তু সত্যি বলছি, আপনাকে আমি বুঝে উঠতে পারি না।'

'সে কি! আপনি কি আমাকে প্যাঁচোয়াড় লোক ভাবছেন নাকি ?'

'মোটেই না! প্যাঁচোয়াড় লোক চিনতে আমার অসুবিধে হয় না। এখানে এসে দু' বছরে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। কলকাতা থেকে এখানে যখন বদলি হয়ে এসেছিলাম, তখন একটা আশা নিয়ে এসেছিলাম গ্রামের মানুষের সেবা করার সুযোগ পেয়ে, বেশ একটা আনন্দ পেয়েছিলাম, ভারি উৎসাহ ছিল মনে। কিন্তু ছ' মাসের মধ্যেই আমার সমস্ত মোহ ঘুচে গেছে। প্যাঁচোয়াড় কাকে বলে, আমি জানি। আপনাকে আমি কখনো সেই চোখে দেখিনে। সেদিক থেকে দেখলে, আপনাকে আমি শ্রদ্ধাই করি—।'

'শ্রদ্ধা ?' শংকর হেসে বলে উঠলো, 'না না ডাক্তারবাবু, শ্রদ্ধা-ট্রদ্ধা বলবেন না। আপনি আমাকে প্রীতির চোখে দেখেন, সেটা জানি, আর সেটাই আমার ভাগ্য। প্যাঁচোয়াড় কথাটা আমি ঠাট্টা করে বলেছি। আমি জানি, আপনি আমাকে সেই চোখে দেখেন না। তবে আপনি একটা কথা ঠিকই বলেছেন, স্বেচ্ছা নির্বাসন না হলেও, আমি গ্রামে থাকাটাই বেছে নিয়েছি, আর তার জন্য মনকে প্রস্তুত

রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু আপনি মুখে না বললেও, এখান থেকে চলে যেতে চান, সেটা আমি বুঝি। তাই ও-কথা বললাম।'

সুজিতের আরও কিছু বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুজনেই তখন থানার গেটের সামনে এসে পড়েছে। থানার বারান্দায় দুদিকে দুটো হ্যারিকেন জ্বলছে। সামনের ঘরে হ্যাজাকের জোরালো আলোটা বাইরে থেকে দেখা যায় না, কিন্তু তার রেশ বাইরে এসে পড়েছে। দু' পাশের ঘরেও আলো জ্বলছে। দেখা গেল, থানার প্রাঙ্গণে, এক পাশে একটি জীপ, অন্য পাশে বুধাইকে চাপা দেওয়া সেই গাড়িটি। গ্রামের লোকেরা ভিড় করে আছে থানার প্রাঙ্গণে, বারান্দার ওপরে। একজন মাত্র সেপাই সামনের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। লোকজনের মধ্যে কে বলে উঠলো, 'অই, শংকর মাষ্টের আর ডাক্তারবাবু আইচেস গ।'

সুজিত বারান্দার গায়ে সাইকেল ঠেকিয়ে রাখলো। শংকর সামনের অফিস ঘরে ঢুকলো। মাঝবয়সী ও. সি. বসে ছিলেন টেবিলের উল্টো দিকে। তাঁর মুখোমুখি চেয়ারগুলোতে গুইরাম পাল, কার্তিক, গাড়ির চালক সেই যুবক, এবং গ্রামের আরও দুজন মাতব্বর স্থানীয় লোক। শংকর দুজনকেই চেনে। একজন গ্রামের মাধ্যমিক স্কুলের কমিটি মেম্বার, শরত বেরা, শংকর যে স্কুলের শিক্ষক। অন্যজন গুইরামের রাজনৈতিক দলের একজন নেতা, পাশের গ্রামের অধিবাসী শিবু চক্রবর্তী। বোধ হয় কোনো কারণে এদিকে এসেছিল, এবং খবর পেয়ে থানায় এসেছে।

ও. সি. চেয়ারে বসেই আপ্যায়ণ করলেন, 'এই যে শংকরবাবু, আসুন। কিন্তু আপনার কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কেন? গালেও দেখছি ওষুধ মাখানো?'

'ও কিছু নয়।' শংকর তাচ্ছিল্যের সুরে বললো। কিন্তু ও অবাক হলো, অফিস রুমের পরিস্থিতি আর পরিবেশ দেখে। সকলেই প্রায় সিগারেট টানছে, এবং চা পান চলছে।

ইতিমধ্যে সুজিত ঢুকলো। ও. সি. এবার দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই

তো, ডাক্তারবাবুও এসে গেছেন। আসুন আসুন।' মুখ তুলে ডাকলেন, 'ভজন কোথায় গেলে ? ছোটবাবুর ঘর থেকে দুটো চেয়ার এনে দাও তো। আরো দু' কাপ চা-ও দিতে বল।'

ডানদিকের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে একজন সেপাই দুটো চেয়ার এনে, সামনে জায়গা না পেয়ে, ও. সি-র দিকে একপাশে রাখলো। শংকর ইতিমধ্যে বাঁ দিকের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেলো, বেঞ্চের ওপর বসে আছে, গাড়ির সেই দুই তরুণী এবং কিশোর। তাদের হাতেও চায়ের কাপ। সুজিতও সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো। বাকিরা মুখ ফিরিয়ে দুজনকেই দেখছিল। সুজিত আগে এগিয়ে গেল চেয়ারের দিকে। তার হাতে হাসপাতালের রিপোর্টিং প্যাড। শংকরও টেবিলের অন্য দিকে যেতে যেতে লক্ষ্য করলো, গাড়ির চালক সেই যুবকটি উঠে দাঁড়ালো। তার চোখ শংকরের দিকে।

ও. সি. চেয়ারে বসে, শংকরের দিকে তাকিয়ে, হাত দিয়ে যুবককে দেখিয়ে বললেন, 'শংকরবাবু, এ ভদ্রলোক তো আপনার বন্ধুর ভাই, আপনি চিনতে পারেন নি ?'

শংকর থমকে দাঁড়িয়ে যুবকের দিকে তাকালো। এখন আর যুবকের মুখে বা চোখে কোনো ভয়ের ছায়া নেই। সে যেন অনেকটা সহজ আর সাবলীল হয়ে উঠেছে। কিন্তু শংকরের দিকে তাকিয়ে হাসতে গিয়ে তাকে কিছুটা অপ্রস্তুত দেখালো, এবং কিছুটা লজ্জিতও। শংকর এই প্রথম যুবকটির মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো, ওর চোখে জিজ্ঞাসু অনুসন্ধিৎসা।

যুবক বললো, 'আমাকে আপনি অনেকবার দেখেছেন, আমাদের কলকাতার বাড়িতে। আমার দাদার নাম প্রিয়ব্রত বিশ্বাস, আপনার বন্ধু—।' কথাটা শেষ না করে সে চুপ করে গেল।

শংকরের ভুরু কুঁচকে উঠলো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটি মুখ, মধ্য কলকাতায় একটি বড় বাড়ি, ধনী পরিবার। ও বললো, 'তার মানে তুমি—সরি আপনি—'

'আপনি না শংকরদা, তুমি।' যুবক বললো, 'আমাকে আপনি

নাম ধরেই ডাকতেন। আমার নাম সুব্রত।'

শংকর মাথা ঝাঁকিয়ে অল্প হেসে বললো, 'চিনতে পেরেছি তবে তোমার চেহারা অনেক বদলে গেছে।'

সুব্রত নামে যুবক বললো, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন শংকরদা, আপনাকে আমি চিনতে পারি নি,—মানে, ভাবতেই পারি নি, আপনি এ রকম কোনো জায়গায় থাকতে পারেন।'

'তাই একেবারে খুনীর মতো মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন, আর মারাত্মক ভাবে—'কথাটা শেষ না করে সুজিত সুব্রতর দিকে তাকালো ওর চোয়াল আর চোখের দৃষ্টি শক্ত হয়ে উঠেছে।

শংকর সুজিতের দিকে তাকিয়ে চোখের দৃষ্টিতে তাকে নিরস্ত থাকতে অনুরোধ করলো। সুব্রতর দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'আমি কোথায় থাকি না থাকি, তোমার অবিশ্যি জানবার কথা নয়। দাঁড়ালে কেন, বস।'

সুব্রত তথাপি না বসে বললো, 'শংকরদা, আমার অপরাধের তুলনা নেই। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। দাদা যখন সব কথা শুনবে, আমাকে বোধ হয় মেরেই বসবে।'

সুজিত ছাড়া, সুব্রতর কথায় সবাই হেসে উঠলো। শংকর বুঝতে পারলো, সুব্রতর প্রতি কারোরই আর তেমন বিদ্বেষ বা রাগ নেই। সকলেই মোটামুটি প্রসন্ন। ইতিমধ্যে এখানে কী কথাবার্তা হয়েছে বা ঘটেছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কেবল এটা অনুমান করা যায়, থানার ও. সি. এবং মাতব্বর ব্যক্তিদের সুব্রত যে-ভাবেই হোক, নিজের আয়ত্তে আনতে পেরেছে। শংকর স্বস্তিবোধ করলে। ওর আশংকা ছিল, পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠবে, একটা দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে, নতুন দুর্ঘটনার সূত্রপাত হতে পারে। এখন বোঝা যাচ্ছে, পরিস্থিতি অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। কোন্ দিকে, কে জানে। শংকরের মনে অতীতের অনেক ঘটনা ছবির মতো ভেসে উঠতে লাগলো, কিন্তু সে বললো, 'ক্ষমা করার কী আছে। তোমার অনুশোচনাই যথেষ্ট। অন্যায় করা এক কথা, অন্যায়ের বোধ আর এক কথা। তা ছাড়া, এ্যাকসিডেন্ট ইজ এ্যাকসিডেন্ট।'

'ঠিক, ঠিক বলেছেন শংকরবাবু।' ও. সি. বললেন, 'পুলিশের লোক হয়েও আমিও কথাটা মানি, এ্যাকসিডেন্ট ইজ এ্যাকসিডেন্ট।' তিনি অন্যান্যদের দিকে সমর্থনের প্রত্যাশায় হেসে তাকালেন।

গুইরাম বললো, 'তা তো বটেই এ্যাকসিডেন্টের উপর তো কারু কোন কথা চলে নাই।'

'দৈব বলে কথা!' শরত বেরা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল, 'উয়াতে কারু হাত নাই।'

শংকরের কাছে, গুইরাম আর শরত বেরার আচরণ কেমন অভাবিত মনে হলো। তাদের এতোটা যুক্তিবাদী আর উদার কখনো দেখা যায় নি। কেবল সুজিতের মুখটা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছিল, চোখে সন্দেহ। সুব্রত বাঁয়ের খোলা দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলো, 'করবী এদিকে এসো একবার।'

বাঁদিকের ঘর থেকে যে-তরুণী বেরিয়ে এলো, তাঁর সিঁথেয় সিঁদুর। তার উৎকণ্ঠিত উদ্‌ভ্রান্ত চোখে মুখে এখন অনেকটা স্বস্তির ছাপ লক্ষণীয়। সে প্রথমেই তাকালো শংকরের দিকে। সুব্রত বললো, 'তোমাকে বলেছিলাম, উনি আমার চেনা। আমি প্রথমটায় একেবারে চিনতে পারি নি। শংকরদা আমাদের মেজদার বন্ধু।' সে শংকরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার স্ত্রী করবী।'

শংকর কিছু বলবার আগেই করবী দ্রুত শংকরের কাছে এসে, একেবারে ওর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। শংকর বিব্রত শশব্যস্ত হয়ে দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে বললো, 'আহা, করেন কী, করেন কী?'

শরত বেরা বলে উঠলো, 'আহা আপনি হল্যেন উঁয়ার ভাসুরের বন্ধু, পেন্নাম করবেন নাই ক্যানে?'

করবীর চোখ ছলছলিয়ে উঠলো, ভেজা গলায় বললো, 'ওর মাথার ঠিক ছিল না, ওকে আপনি ক্ষমা করুন।'

'আরে, ক্ষমা-টমার কথা আসছে কেন?' শংকর হেসে বিকৃত স্বরে বললো, 'আমি জানি, সুব্রতর মনের অবস্থা তখন কেমন ছিল। আপনি বসুন।'

করবী তবু বললো, 'আমি জানি, ও খুব অন্যায় করেছে, আপনি রাগ করবেন না।'

'আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আমার কোনো রাগ নেই।' শংকর প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চাইলো।

সুব্রত বলে উঠলো, 'ওকে আপনি বলবেন না শংকরদা।'

'বটে কথা, বটে কথা।' গুইরাম শরত বেরা একসঙ্গে বলে উঠলো।

সুব্রত আবার বললো, 'মেজদা তো এখন আমেরিকায় আছে, জানেন বোধ হয়। গত বছর আমার বিয়ের সময় এসেছিল। আপনার খোঁজ করছিল। আপনাদের কাঁসারিপাড়ার বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, সেখানে অন্য এক ফ্যামিলি। আপনার মা ভাই—।'

'ও-বাড়ি বদলানো হয়েছে তিন বছর।' শংকর বাধা দিয়ে বললো, 'মা এখন যাদবপুরে আছেন।' একটু দ্বিধা করে করবীকে বললো, 'তুমি ও ঘরে গিয়ে বস।'

সুব্রত বললো, 'করবী, ওদের ডেকে দিলে না?'

'না না, থাক। ওদের আবার ডাকাডাকি কেন? শংকর বললো।

করবী ফিরে গেল বাঁদিকের ঘরে। সুব্রত আবার বললো, 'ওরা আমার শালী আর শ্যালজ। যাচ্ছিলাম বাঁকুড়ায়, শ্বশুরবাড়িতে। কার মুখ দেখে যে যাত্রা করেছিলাম।'

'উ সব ভেবে আর কী হবেক মশাই।' শরত বেরা বললো, 'সবই কপালের লিখন।'

শংকর সুজিতের পাশের চেয়ারে বসলো। ও. সি. বললে, 'এবার তাহলে কাজের কথা হোক। শংকরবাবু আর ডাক্তারবাবু এসে গেছেন। বদি বাউরির বিধবা বউ না কে, সে কোথায় গেল?'

'সে হাসপাতালে রয়েছে।' শংকর বললো।

ও. সি. বললো, 'তাকে ডাকতে হয়। সে-ই আসল লোক।'

গুইরাম উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'বদির বউকে আমি ডাকা করাচ্ছি।' সে বাইরে গেল।

ও. সি. বললেন, 'যাকেই পাঠান, সঙ্গে একজন সেপাইও যাক।' তিনি গলা তুলে ডাকলেন, 'বচন সিং।'

'হাঁ সাব।' বাইরে থেকে জবাব এলো, এবং তারপরেই একজন অবাঙালী সেপাই ডানদিকের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকলো।

ও. সি বললেন, 'তুমি গুইরামবাবুর লোকের সঙ্গে হাসপাতালে যাও।' সুজিতের দিকে ফিরে বললেন, 'ডেডবডি এখানে আনার কোন দরকার নেই। যা ব্যবস্থা করার ওখান থেকেই হবে।'

গুইরাম আবার ঘরে ঢুকে বললো, 'শরতবাবু আপনি একবারটি হাসপাতালে যান, বদির বউয়ের সাথে কর্থাবত্তা করেন যেইয়া।'

'হাঁ হাঁ।' শরত বেরা চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের বাইরে চলে গেল।

গুইরাম ঘরে ঢুকে নিজের চেয়ারে বসলো। সুজিত ও. সি-কে জিজ্ঞেস করলো, 'ডেডবডি কি সদরে চালান দেবেন?'

'ময়না তদন্তের দরকার না হলে, সদরে পাঠাবার দরকার কী?' ও. সি. তাকালেন গুইরামের দিকে, 'আপনারা যা ভেবেছেন, সে কথা এঁদের বলুন।'

গুইরাম গলা খাকারি দিয়ে একবার শিবু চক্রবর্তীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলো, তারপর শংকর আর সুজিতের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমরা ভেবে দেখলাম, কেস-টেসের হাঙ্গামায় যেয়্যে কুন লাভ হবে নাই। মামলা মুকদ্দমা হল্যে বিস্তর ল্যাটা। বদির বউয়ের সময় কোথা, কোর্ট-কাচারি করবে। মামলার কী ফল হবে তাই বা কে জানে।'

'কেস তো করবে পুলিশ।' সুজিত বললো, 'সাক্ষী থাকবো আমরা আপনারা। বদির বউ তো কেস করবে না।'

গুইরাম বললো, 'তা করবে না। পুলিশ কেস করলেও, বদির বউয়ের লাভটা কী হবে বলেন।'

সুজিত ও. সি-কে জিজ্ঞেস করলো, 'এফ আই আর হয় নি?'

'না।' ও. সি. বললেন, 'গুইরামবাবুরা মিটমাটের পক্ষপাতী। সুব্রতবাবু বদির বউকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দু' হাজার টাকা দেবেন

বলছেন। বদির বউ রাজি হলে, টাকাটা তিনি এখনই দিতে পারেন।'

শংকরের সঙ্গে সুজিতের চোখাচোখি হলো। শংকর মনে মনে অবাক হচ্ছিল, গুইরামের মতো লোক এত সহজে মিটমাটের পক্ষপাতী হলো কেমন করে? এফ. আই. আর. না করার অর্থ, ও. সি-ও মিটমাটের পক্ষপাতী। এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটনার গতি এমন একটা মোড় নিয়েছে, মনের মধ্যে কেমন একটা খটকা লাগছে। অথচ করার কিছু আছে বলেও মনে হয় না।

সুজিত বললো, 'কিন্তু আমাকে তো একটা রিপোর্ট দিতেই হবে।'

'তা দেবেন না কেন?' ও. সি. হেসে বললেন, 'কিন্তু আপনি তো সুব্রতবাবুর বিরুদ্ধে হোমিসাইডাল রিপোর্ট দিতে পারবেন না, আর ব্যাপারটাও তা নয়। এ্যাকসিডেণ্টাল ডেথ্।'

গুইরাম বললো, 'মামলার ফলাফল কার দিকে যাবে, তা কেউ বলতে পারে নাই। গরীব বউটা যদি দু' হাজার টাকা পায়, কিছুটা সুরাহা হয়। কী বলেন শংকরবাবু?'

শংকর ভাবলো, অঞ্চল প্রধান সহৃদয় হতে পারে, বদির বউয়ের সাশ্রয়ের আশায়। পুলিশের এমন সহৃদয় পক্ষপাতিত্ব একটা অভাবিত ব্যাপার। ওর সন্দেহ বাতিক নেই, কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতাকে একেবারে তুচ্ছ করতে পারে না। ওর মন বলছে, কোথায় যেন কী কলকাটি নাড়া হয়ে গিয়েছে, যার গভীরে মিথ্যা হাতড়ে বেড়ানো ছাড়া আর কিছু করার নেই। অঞ্চল প্রধান গুইরাম শংকরকে পছন্দ করে না, কারণ ও এ গ্রামে বাস করে, ইস্কুলে মাস্টারি করেও, তার কথায় সব সময় সায় দিতে পারে না। সেও শংকরের সমর্থন চেয়ে মতামত জিজ্ঞেস করছে। থানার বড়বাবু আচরণের মতো, এটাও অবাক করার মতো ব্যাপার। আবার অন্য দিক থেকে বিষয়টিকে দেখতে গেলে, বদির বউয়ের করবারই বা কী আছে? একমাত্র দর কষাকষি করে, বদির বউয়ের টাকা আরও কিছু বাড়ানো যায়। সেটাও শংকরের পক্ষে সম্ভব না। গুইরামদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। কিন্তু স্বয়ং গুইরাম, পঞ্চায়েত সভ্য কার্তিক, শরত বেরার মতো সঙ্গতিপন্ন

গ্রামের মাতব্বর আর প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতা শিবু যেখানে এক মত হয়েছে, আর বোধ হয় তার ওপর কোনো কথা চলবে না। নিঃসন্দেহে সুব্রত যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও চালাক ছেলে। শংকরের চোখে যারা অতি কঠিন মানুষ, তাদের সে বশ করতে পেরেছে। কী দিয়ে? সে-প্রশ্নও অবান্তর। যে পথ চলতে এক কথায় দু' হাজার টাকা বের করে দিতে পারে, সে আরও ক' হাজার টাকা ব্যয় করতে পারে, কে জানে। শংকর গম্ভীর মুখে বললো, 'আমি আর কী বলবো। মনে হচ্ছে, আপনারা এর মধ্যেই আলোচনা করে একটা নিষ্পত্তির কথা ভেবেছেন।'

'সেটা আপনার মনের মতো হয়েছে কিনা, সেটাই আসল কথা।' ও. সি. বললেন, 'মামলা হলে আপনিই হবেন প্রধান সাক্ষী, সেজন্যে আপনার মতামতটা জানা দরকার। আপনার কি মনে হয়, মামলা হলে বদির বউয়ের বিশেষ কোনো সুবিধে হবে?'

শংকর বিষণ্ণ হেসে বললো, 'হয় তো' এ ক্ষেত্রে যে আসামী তার সাজা হয়ে যেতে পারে, কিন্তু বদির বউ তার ছেলে বুধাইকে কোনো দিনই ফিরে পাবে না।'

কার্তিক বলে উঠলো, 'অই, উ কথাটাই আমরাও বুলছিলাম। তার চেয়ে বউটা যদি কিছু টাকা পায়, উটি অনেক কাজ দিবে।'

'আমার অবিশ্যি ভিন্ন মত।' সুজিত বললো, 'এ্যাকসিডেন্টে মৃত্যু হয়েছে, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সুব্রতবাবু ছেলেটাকে চাপা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন, আর সে চেষ্টা, করতে গিয়ে তিনি—।' সুজিত কথা শেষ না করে শংকরের দিকে তাকালো।

শংকর সুজিতের দিকে তাকিয়ে ছিল। সুজিত বললো, 'যাই হোক, আমি আমার রিপোর্ট দিয়ে দিচ্ছি। হাসপাতালেও একটা রেকর্ড রাখতে হবে। ডি. এম. ও-কেও আমি রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবো।'

'তা তো আপনি নিশ্চয়ই দেবেন।' ও. সি. বললেন, 'আপনার ডিউটি আপনি করবেন। তবে বদির বউয়ের ব্যাপারটাই যখন আসল ফ্যাকটার, আপনার কি মনে হয় না ডাক্তারবাবু, ডিসিশনটা ঠিকই নেওয়া হয়েছে?'

সুজিতের মুখ কঠিন। বললো, 'এ বিষয়ে আমি আর কিছু বলতে চাইনে। বলার মধ্যে একটাই কথা, বুধাইকে চাপা দেবার থেকেও গর্হিত অপরাধের কাজ করেছেন সুব্রতবাবু। কিন্তু শংকরবাবু যখন ওঁকে ক্ষমা করছেন, আমার আর কী বলার থাকতে পারে।' সে হাঁটুর ওপর হাসপাতালের ছাপানো প্যাড রেখে, পকেট থেকে কলম বের করে খস্‌খস্‌ করে বুধাইয়ের মৃত্যুর কারণ লিখতে লাগলো।

সুব্রত তাকিয়ে ছিল শংকরের দিকে। শংকর দ্বিধাগ্রস্ত, অথচ কিছুটা অসহায়। গুইরাম, কার্তিক, শিবু তিনজনেই সুজিতের দিকে স্পষ্ট চোখে তাকালো। ইতিমধ্যে একজন ভৃত্য শ্রেণীর লোক দুটো কাচের গেলাসে চা এনে শংকর আর সুজিতের সামনে টেবিলে রাখলো। এই সময়েই বাইরে একটা গুঞ্জন শোনা গেল, সেই সঙ্গে কান্নার ফোঁস ফোঁস শব্দ। শরত বেরার গলা শোনা গেল, 'আ, অই শুন ক্যানে বদির বউ, কাঁদিস না, বিটাটাকে ছাড়, অফিস ঘরকে ঢুকবি চল্‌। মড়া আগুল্যে বস্যে থাকলে কি উ জ্যান্ত হবেক ? চল্‌ চল্‌।'

গোলকের গলা শোনা গেল, 'তুমরা সব জায়গা ছাড় দি নি, টেচারটা রাখতে ছাও ক্যানে।'

টেচার নিশ্চয়ই স্ট্রেচার। বুধাইয়ের মৃতদেহ সম্ভবতঃ স্ট্রেচারে বারান্দায় তুলে রাখা হচ্ছে। শরত বেরা এক রকম ঠেলতে ঠেলতেই বদির বউকে অফিস ঘরে ঢোকালো। বাঁদিকের ঘর থেকে করবী বেরিয়ে এসে বদির বউয়ের সামনে দাঁড়ালো। সুব্রত উঠে দাঁড়ালো। শরত বেরা বললো, 'চখ মেল্যে ছাখ্‌ ক্যানে, এঁয়ারা কি তোর বিটাকে ইচ্ছা কর্যে মেরে ফেলাইচে ?'

'উ কথা আমি বুঝি নাই গ বাবু।' বদির বউ কান্না ভাঙা স্বরে বললো, 'আমি স্যায়না বয়সে ভাতার খাইচি, বড় বিটা খাইলম, আমার ক্যানে মরণ হয় নাই গ ?'

শংকর দেখলো, সুব্রত আর করবী দৃষ্টিবিনিময় করলো। সুব্রত মাথা নিচু করলো। গুইরাম চেয়ারে ঘুরে বসে বললো, 'অই বদির বউ, কেউ কারুকে খায় না, তু ক্যানে সোয়ামী বিটা খাবি ? দৈবের কথা কে বুলতে পারে ? তু মরলে চলবে ক্যানে। তোর আরো দুটো

কাঁচাগুড়া রইচে, উয়াদের মানুষ করতে হবেক নাই ?'

'হঁ, আর দুটো প্যাটের শত্তুর রইচে, উয়াদের লেগ্যে আমি মইত্তেও পারব নাই।' বদির বউ বললো, 'কথা বাবু ঠিক বুল্যেচ। তা দৈব আমাকে লিলে, উ দুটোকে দৈব অক্কে কইরবে।'

গুইরাম বললো, 'উ সব কথা এখন রাখ বদির বউ, কাজের কথা শুন্। তু কি চাস্ মামলা লডবি ?'

'মামলা মুকদ্দমার আমি কি বুঝি গ বাবু। আপনারা যা ভাল বুঝ, কর।' বদির বউ দেওয়ালে হেলান দিয়ে, ঘাড় কাত করে দাঁড়ালো, 'আমার বুধাইকে ত কেউ ফিরাই দিতে লারবে।'

'হঁ, ত তোর ক্ষেতি পুরণের লেগ্যে ই মাঠান আর বাবু তোকে দু' হাজার টাকা দিবেন।' শরত বেরা বললো, এবং করবী ও সুব্রতর দিকে তাকিয়ে গদগদ মুখে হাসলো।

বদির বউ লাল ফোলা চোখ দুটো বড় করে, যেন ভয় পেয়ে বললো, 'দু হাজার ট্যাকা চখে দেখি নাই কখুনও, অত ট্যাকা লিয়ে আমি কী করব গ ? রাখব কুথা ? উয়াতে আমার দরকার নাই।'

বদির বউয়ের কথায় গুইরামের দল হেসে উঠলো। হাসবার কথা বটে। টাকা নিতে ভয় পায়, তাও যেচে দেওয়া টাকা, এমন মানুষ হাসির পাত্র ছাড়া আর কী হতে পারে। এই সময়েই সুজিত একটি কাগজ ও. সি-র দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'এফ. আই. আর. হয় নি, হোমিসাইড কেস নয়, ব্যাপারটা মিটমাট হচ্ছে অন্য ভাবে, আমার রিপোর্টের মূল্য কিছু নেই, তবু আমি আমার ডিউটি করলাম।'

ও. সি. কাগজটা নিয়ে তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, একটি মোটা খাতা টেনে নিয়ে পাতা মেলে কাগজটি রেখে, দ্রুত কিছু লিখলেন, বললেন, 'আমি সই করেছি, আপনি এখানে একটা সই করে দিন ডাক্তারবাবু।'

সুজিত ঝুঁকে পড়ে সই করে বললো, 'শংকরবাবু, আপনি ওষুধগুলো খেতে ভুলবেন না। জ্বর হলে কালই একবার খবর দেবেন, আর তিন দিন বাদে হাসপাতালে ড্রেসিংয়ের জন্য আসবেন।' সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

শংকর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।'

'অই গ মাস্টেরবাবু, আপুনি হেথাকে রইচ? আমি দেখি নাই গ।' বদির বউ শংকরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপুনি টুকুস থাক, ইয়াদের কথা আমি বুইতে লারছি।'

শংকরের সঙ্গে সুজিতের চোখাচোখি হলো, সুজিত বললো, 'আপনি থাকুন। আমি এখন বালিকান্দা গাঁয়ে একটি রুগী দেখতে যাবো।' সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সকলেই চুপচাপ ডাক্তারের চলে যাওয়া লক্ষ্য করলো। গুইরামের ঠোঁট জোড়া বেঁকে উঠলো, এবং কার্তিক আর শিবুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলো। শরত বেরা বলেই উঠলো, 'আমাদিগের ডাক্তারবাবুটির বয়স অল্প, মেজাজটি বড় গরম।'

'থাক, আপনাকে আর ডাক্তারবাবুর সমালোচনা করতে হবে না।' ও. সি. প্রায় ধমকের সুরে বললেন, 'উনি যা করেছেন, ঠিকই করেছেন।'

শিবু চক্রবর্তী এই প্রথম কথা বললো, 'তা হয় তো করেছেন, তবে ডাক্তারবাবু এমন একটা ভাব করলেন, যেন আমরা অন্যায় কিছু করেছি।'

'তা কেন?' ও. সি. বললেন, 'উনি খুশি হন নি, তা না হতেই পারেন। আপনি তো আর জোর করে সবাইকে সব কিছু মানাতে পারেন না।'

শিবু চকিতে একবার শংকরের দিকে দেখলো। মুখ শক্ত করে চুপ করে রইলো। শংকর বদির বউকে বললো, 'শোন বদির বউ, বোঝাবুঝির তো কিছু নেই। এঁরা সবাই ঠিক করেছেন, মামলা মোকদ্দমায় না গিয়ে, একটা মিটমাট করে নেওয়া। তাই তোমাকে দু' হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে।'

বদির বউ বললো, 'কিন্তু ট্যাকা লিয়ে আমি কী করব মাস্টেরবাবু? রাখব কুথা?'

'কোথায় আবার রাখবে, ডাকঘরে রাখবে।' ও. সি. বললেন, 'টাকা দিয়ে কী করতে হয়, তুমি বোঝ না? ডাকঘরে টাকাটা থাকলে,

সুদ জমবে। আপদে বিপদে খরচ করতে পারবে।'

মাঝবয়সী দশাসয়ী চেহারার বড়বাবুর কাটখোট্টা কথা শুনে, বদির বউ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তাকালো শংকরের দিকে। ও. সি. চারদিকে চোখ বুলিয়ে বিরক্ত স্বরে বললেন, 'মেজোবাবুর ছোটবাবুর ফিরতে কতো দেরী কে জানে।' তিনি নিজেই খাতা টেনে কিছু লিখতে লাগলেন, আর লিখতে লিখতেই বললেন, 'গুইরামবাবু, কাগজ কলমটা নিয়ে একটা খতপত্র লিখে, বউটির টিপ ছাপ নিয়ে নিন। খতের বয়ান যেন ঠিক থাকে।' মুখ তুলে সুব্রতকে বললেন, 'আপনি টাকাটা বের করুন।' বলে আবার লিখতে লাগলেন।

সুব্রত করবার দিকে তাকালো। ছুজনেই পাশের ঘরে গেল, এবং দরজাটা ভেজিয়ে দিল। গুইরাম বললো, 'শরতদা, তুমি খতটা লিখ, তুমি উসব ভাল বুঝ।'

'ইসটাম্পো পেপার ছাড়া কি অত লিখা হবে?' শরত বেরা জিজ্ঞেস করলো।

ও. সি. মুখ তুলে বিরক্ত স্বরে বললো, 'আরে মশাই এ কি জমি বাড়ির দলিল বেচা কেনা হচ্ছে নাকি? সুব্রতবাবুর নাম ঠিকানা বাড়ির নম্বর ইত্যাদি লিখে, ওঁর কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কথা লিখে দিন। ছুটো কাগজে লিখুন, একটা থানায় থাকবে, আর একটা সুব্রত-বাবুকে দেওয়া হবে। আসল কাজ আমার এখানেই হচ্ছে।' তিনি বদির বউয়ের দিকে মুখ তুলে ডাকলেন, এস এদিকে এস একবার।' রাবার স্ট্যাম্পের কালির প্যাডের ঢাকনা খুললেন।

বদির বউ এগিয়ে গেল। ও. সি. তার বাঁ হাত টেনে নিয়ে, বুড়ো আঙুলটা কালির প্যাডে চেপে দিলেন, তারপরে টিপ ছাপ নিয়ে নিলেন খোলা পাতার এক পাশে। শংকরের দিকে ফিরে বললেন, 'শংকরবাবু এটা একটা নিয়মমাফিক মামুলি ব্যাপার। কেস্ তুলে নেওয়ার একটা রিপোর্ট। থানার রেকর্ড। কোনো কাজে লাগবে না তবু রেখে দেওয়া ভালো। আপনি আর গুইরামবাবু সই করে দিন, আমি সই করেছি।'

শংকর হেসে বললো, 'আমাকে আর ও সবের মধ্যে টানবেন

না। আপনারা যারা মিটমাট করার ব্যবস্থা করেছেন, তাঁরাই সই সাবুদ করুন। শুধু এটুকু জেনে রাখুন, আমার কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।'

'অভিযোগ নেই, সেটা প্রমাণ করার জন্যই সাক্ষী থাকুন না।' শিবু বললো।

শংকর জানে, শিবু বালিকান্দা গ্রামের ছেলে হলেও, রবীন্দ্র ভারতী থেকে এম. এ. পাশ করেছে। তার কথায় গ্রামীন আঞ্চলিকতা নেই। সম্ভবতঃ সে সেজন্য গর্বিত। তা ছাড়া শিবু বর্তমান শাসক রাজনৈতিক দলের আঞ্চলিক নেতা। আগামী নির্বাচনে এখন থেকেই স্থির হয়ে আছে, সে এম. এল. এ-র টিকিট পাবে। পার্টির বর্তমান এম. এল. এ রাখাল রায়ের থেকেও তার কর্তৃত্ব আর গলার জোর বেশী। রাখাল রায়ও শংকরের ইস্কুলের একজন মধ্যবয়স্ক শিক্ষক, গ্রামীন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান.। শিবু তাঁকে 'কুলাক' বলতেও দ্বিধা করে না। যদিও সে নিজেও সেই শ্রেণীরই সন্তান. কিন্তু মিলিট্যাণ্ট, কলকাতার নেতাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক রাখালবাবুর থেকে বেশি শংকর হেসেই জবাব দিল, 'সাক্ষী না থেকেও সেটা প্রমাণ করা যায়। অযভিগেগ করলে তো সুব্রতর বিরুদ্ধে আমি আলাদা কেস্ করতে পারতাম। ও সব কিছুই আমি করছি না।'

'ঠিক আছে, আপনাকে আমি এ নিয়ে চাপ দেবো না।' ও. সি. বললেন, 'শুইরামবাবু আর কার্তিকবাবু সই করলেই হবে। তবে আমি জানি, এ্যাকসিডেন্টের সময় আপনি সেখানে না থাকলে, ঘটনা অন্য রকম ঘটতো।'

এই সময়ে বাঁদিকের ঘরের ভেজানো দরজা খুলে করবী আর সুব্রত বেরিয়ে এলো। করবীর হাতে একগোছা একশো টাকার নোট। সে বদির বউয়ের সামনে এসে নোটের গোছা এগিয়ে দিয়ে বললো, 'নাও। তুমি আমাদের ক্ষমা করো।'

'অই মা গ আমি কাকে ক্ষ্যামা করবক।' বদির বউ ক্রস্ত হয়ে দু'পা পেছিয়ে গিয়ে বললো, 'উ ট্যাকা আমি কুথাকে লিয়ে যাব। আপনি মাষ্টেরবাবুকে দিয়া কর।'

শংকর বললো, 'না না, ও টাকা এখন থানার বড়বাবুর হেপাজতেই থাক। রাত বিরেতে এতগুলো টাকা নিয়ে বাইরে কারোর না যাওয়াই ভালো। কাল পোস্টঅফিস খুললে, এঁরা কেউ তোমাকে নিয়ে গিয়ে টাকাটা জমা দিয়ে দেবেন।'

'তবু টাকাটা তুমি নিজের হাতে আগে নাও।' ও. সি. বদির বউকে বললেন।

বদির বউ একবার শংকরের দিকে তাকালো, তারপর করবীর দিকে। এখন বদির বউয়ের লাল ফোলা চোখ দুটো শুকনো, দৃষ্টি বিভ্রান্ত। দুর্ঘটনায় নিহত ছেলে ঘরের বাইরে। শহরের আধুনিক ধনী পরিবারের তরুণী বধূ টাকার গোছা নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে। শংকর বুঝতে পারছে, বদির বউয়ের এ বিভ্রান্তি লোভ না, তার শোকসন্তপ্ত প্রাণ এক অভাবিত পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিমূঢ় হয়ে উঠেছে। ঘটনার গতি প্রকৃতি সবই তার অগম্য। করবী বদির বউয়ের ডান হাতটি টেনে নিয়ে নোটের গোছা তুলে দিল। বদির বউ চোখ বুজলো, আবার জলের ধারা নামলো চোখের কোলে, যেন বড় কষ্টে, রুদ্ধস্বরে উচ্চারণ করলো, 'অই, গা। আমি কী লিচ্ছি গ ?'...

শংকর মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সুব্রত ত্রস্ত হয়ে এগিয়ে এলো, 'চলে যাচ্ছেন শংকরদা ?'

'হ্যাঁ ভাই।' শংকর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, 'আর কি, সব তো মিটেই গেল।' কথাটা বলে ও করবীর দিকে একবার তাকালো। বুঝলো, সামান্য সামাজিকতার কথাটা ও ভুলে যাচ্ছিল। করবীও ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। ও বললো, 'যাচ্ছি ভাই।'

করবী এগিয়ে এলো, শংকরকে প্রণাম করবার জন্য নত হলো। শংকর একটু সরে গিয়ে ব্যস্ত ভাবে বললো, 'থাক না। তোমরা সাবধানে যেও।'

করবী শংকরের কথার মধ্যেই প্রণাম সেরে নিল। বললো, 'আপনার কথা আমি দু-একবার শুনেছি। বাঁকুড়া থেকে ফেরার পথে, আপনার সঙ্গে দেখা করে যাবো।'

শংকর কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। ঘরের সকলের মুখের দিকে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে, করবীর কথার কোনো জবাব না দিয়ে, একটু হেসে ঘরের বাইরে গেল। হ্যারিকেনের আলোয় দেখলো, বারান্দার ওপর স্ট্রেচারে শোয়ানো বুধাইয়ের মৃতদেহ একটি সাদা কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা। পঞ্চু, গোলক এবং আরও প্রায় জনা দশ বারো, বারান্দার ওপরে নিচে দাঁড়িয়ে বা বসে আছে। এখানকার কাজ মিটিয়ে শ্মশানযাত্রা। (গ্রাম পূর্ব দক্ষিণ প্রান্তে, অনামী এক শীর্ণকায়া নদীর ধারে তিনটি শ্মশান। একটি ব্রাহ্মণদের, অন্যটি অব্রাহ্মণ,কিন্তু যাদের জল চল্ আছে, এমন শূদ্র শ্রেণীদের জন্য, তৃতীয়টি অন্ত্যজদের, বাউরি বাগদি হাঁড়ি ডোম যাদের বলে। তবু পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বড় গলার ঘোষণা, এ দেশে জাত-পাতের সমস্যা নাকি, বলতে গেলে নেই। এক সময়ে শংকরও তাই বিশ্বাস করতো।)

শংকর বুধাইয়ের মৃতদেহ থেকে মুখ ফিরিয়ে বারান্দা থেকে নেমে গেটের দিকে এগোল। পিছন থেকে সুব্রত ডাকলো, 'শংকরদা—'

'সুব্রত! তুমি আবার এলে কেন?' শংকর থমকে দাঁড়ালো।

সুব্রত বললো, 'না এসে পারলাম না। জীবনে এই আমার প্রথম এ রকম একটা ফ্যাটাল এ্যাকসিডেণ্ট। কিন্তু আপনাকে আমি—।'

'আবার ও কথা কেন সুব্রত?' শংকর বললো, 'আমাকে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমরা আজ একটু সাবধানে যেও। সামনে বড় একটা শালবনের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। তোমার মা বড়দা বোনেরা সব ভালো তো?'

সুব্রত বললো, 'হ্যাঁ, মোটামুটি। আমি মেজদাকে সব ঘটনা লিখে, আমেরিকায় চিঠি দেবো। আপনার ঠিকানাটা আমাকে বলুন, মেজদাকে লিখে দেবো। মেজদা আপনাকে চিঠি দেবে।'

অন্ধকারে শংকরের মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটলো, বললো, 'প্রিয়ব্রতকে কেন আর এ সব নিয়ে ব্যস্ত করা। থাক না। কিছু মনে করো না, আমি কারোর সঙ্গেই আর যোগাযোগ রাখিনে, কলকাতার বাড়ির সঙ্গেও না। আর রাখবোই বা কার সঙ্গে। মা বাবা মারা গেছেন, বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভাইয়েরা যে-যার

সংসার নিয়ে আছে। আমি এখানে এক কোণে ভালোই আছি।'

'আপনি বিয়ে করেন নি? 'সুব্রত অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

শংকর হেসে বললো, 'না, ওটা আর এ জীবনে হলো না, হবেও না। আর একটা কথা, তোমার স্ত্রী বললো, ফেরার পথে দেখা করবে। আমি বরং বলি, তোমরা অন্য পথে কলকাতায় ফিরে যেও। এ পথে আর না-ই ফিরলে।'

সুব্রত অন্ধকারে শংকরের মুখ দেখবার চেষ্টা করলো, তারপরে বললো, 'কথাটা আপনি বোধ হয় ঠিকই বলেছেন শংকরদা। টাকা দিয়ে মিটমাট হয় তো হলো, কিন্তু এখানকার পরিবেশ—মানে, কেমন যেন ভালো লাগছে না। সব কথা আপনাকে বলতে পারছি নে—।'

'থাক, বলার কী দরকার?' শংকর বাধা দিয়ে বললো, থানার ঘরের দিকে একবার দেখলো, বললো, 'তাড়াতাড়ি কাজ মিটিয়ে চলে যাও। আমি চলি, কাজ আছে।'

সুব্রত হঠাৎ নিচু হয়ে শংকরের পায়ে হাত দিল। শংকর চকিত হয়ে বললো, 'তুমি আবার এ সব ছেলেমানুষি করছো কেন? যাও, কাজ মিটিয়ে নাও গিয়ে।' ও গেটের বাইরে গিয়ে, পূবদিকে হাঁটতে লাগলো।

অন্ধকার গাঢ়। আকাশ ভরা তারা। দূর থেকে মাইকে হিন্দি গান ভেসে আসছে। পশ্চিমে হাট-বাজারের দিক থেকে ভেসে আসছে। এই শালচিতি গ্রামের উপান্তে, হাটের কাছে বড় বড় দোকানপাট। একটা সিনেমা হলও আছে। আছে কোল্ড স্টোরেজ বিল্ডিং। ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে শালচিতির নাম আছে। কেবল এই বন অন্ধকার, দু'পাশে দিগন্তবিসারী মাঠের মাঝখানে, মাইকের ভেসে-আসা গান কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে।

শংকর এখন শীত বোধ করছে। ও দু' হাত পাঞ্জাবীর পকেটে ঢুকিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগলো। কিছুটা যেতেই, পিছনে 'মাস্টেরবাবু' ডাক শুনে থম্‌কে দাঁড়ালো, পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'কে?'

'আমি লেত্য বটি মাস্টেরবাবু'—অন্ধকারে মিশে থাকা লোকটি বললো।

শংকরের চোখে এখন অন্ধকার কিছুটা সয়ে এসেছে। বাউরিপাড়ার নেত্যকে চিনতে ওর ভুল হলো না। ও জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি আবার কোথা থেকে এলে?'

'এঁজ্ঞে, থানা থেকো' নেত্য দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'উ কলকাতার বাবু বদির বউকে কত ট্যাকা দিল্যো গ মাস্টেরবাবু?'

শংকর গম্ভীর হয়ে পা বাড়িয়ে বললো, 'দু হাজার টাকা।'

'দু' হাজার!' নেত্য শংকরের সঙ্গে চলতে চলতে বললো, 'শালা, কত্‌তো ট্যাকা' অই ভগমান' আমার কপালে ক্যানে জুটল নাই?'

শংকর বললো, 'তোমার ছেলে তো মরে নি।'

'মইল্য না ক্যানে গ মাস্টেরবাবু?' নেত্য বললো, 'শালা ঘরে আমার শাত সাতটা কাঁচা গুড়া, খেত্যো পত্যো দিতে পারি নাই এ্যাট্‌টা গাড়ি চাপা পল্যো —'

শংকর ওর অস্বভাবোচিত গর্জনে ফুঁসে উঠলো, 'চুপ করবে?' বলেই থমকে দাঁড়ালো, প্রায় চিৎকার করে উঠলো, 'চলে যাও, চলে যাও আমার সামনে থেকে'

নেত্য বাউরিও থমকে দাঁড়ালো। শংকরকে সে কোনো দিন এমন ক্ষ্যাপা রাগে চিৎকার করতে শোনে নি। সে ভয় পেয়ে প্রথমে দু' পা পেছিয়ে গেল তারপর হাত জোড় করে বললো, 'হঁ যাইচি গ মাস্টেরবাবু, যাইচি' বলেই পিছন ফিরে প্রায় দৌড়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শংকর আবার মুখ ফিরিয়ে চলতে আরম্ভ করলো। ওর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ক্ষতগুলো আর মাথাটা যেন যন্ত্রণা করে উঠলো, আর বুকের মধ্যে একটা কষ্টের অনুভূতি তীব্র হয়ে উঠলো। ও বুকের ওপর দু' হাত চেপে চলতে লাগলো।

শংকর এই শালচিতি গ্রামের উচ্চ মাধ্যমিক ইস্কুলে মাস্টারি নিয়ে

এসেছে, তিন বছর আগে। তিন বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, গত ইংরাজি মাসের জানুয়ারীতে। তার আগে ছিল কলকাতার উত্তর উপকণ্ঠে এক ইস্কুলে। কিন্তু শৈশব থেকে কৈশোর এবং প্রথম যৌবনে পা দিয়ে কখনো ভাবে নি, ও একজন ইস্কুল মাস্টার হবে। ওর উচ্চাশা ছিল তীব্র, লক্ষ্য ছিল বিশ্বের পশ্চিম জগতের দিকে, ভাবতো এমন একটা কিছু করবে, তাক লাগিয়ে দেবে পৃথিবীকে। ষাটের দশকের একেবারে গোড়ায়, রক্তে তখন আরবী ঘোড়ার টগবগে ছটফটে ভাব, ছুটে বেরিয়ে পড়ার অপেক্ষা মাত্র তখন ও ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে কলকাতার নাম করা কলেজের ছাত্র দেশ কাল মানুষের প্রতি কেমন একটা কৃপা ও করুণার চোখে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসতো। নিজের চিন্তার সেই বৈশিষ্ট্যতাকে ও দেমাক দেখিয়ে জাহির করে বেড়াতো না, মনে মনে রাখতো। অথচ পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দেবার মতো, কাজের ধারা আর যাত্রা পথটা ওর কাছে স্পষ্ট ছিল না। ভালোই ছাত্র ছিল সে। খেলাধূলায় ছিল চৌকস। চেহারাটা ছিল ছ' ফুটের মতো লম্বা, নাক চোখ মুখ সব মিলিয়ে যাকে বলে, কান্তিমান। যে-কোনো বিষয়ে কলেজের ডিবেটে অংশ নিয়ে, প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতো অনায়াসে অধ্যাপকেরা মুগ্ধ ছিলেন ভক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ওকে ঘিরে থাকত। সব সময় ওকে তুলনা দিতো সেই সময়ের নাম করা খেলোয়াড় বা ফিল্মের টপ্ হিরোদের সঙ্গে। ও হাত ঝেড়ে সব নস্যাৎ করে দিতো, আর মনে মনে ভাবতো, খেলোয়াড় হতে হলে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাবো অলিম্পিকের ক্রীড়াঙ্গনে। ফিল্মের জন্য তো হলিউড আছে। কিন্তু ও-সব ছেঁদো ব্যাপার। তার চেয়েও বড় কিছু হবার স্বপ্ন দেখতো ও। কিন্তু সেই বড়ত্বের কোন্ আসনটা ওর জন্য কোথায় পাতা ছিল, সেটাই ভেবে উঠতে পারে নি। তবে অনার্স পাশ করে, ও যে বিলেত চলে যাবে, সেটা এক রকম ঠিক করেই রেখেছিল। কলকাতা দিল্লী বোম্বাইকে ও পাত্তা দিতে রাজি ছিল না।

সব কিছুরই একটা পশ্চাদ্‌পট থাকে। শংকরের তখন সেটা মনে রাখবার কথা না, কারণ সেই বয়েসে ওর মতো কোনো ছেলেই

সেদিকটার কথা ভাববার প্রয়োজন বোধ করে না। দরকারও হয় না। ওর বাবা ছিলেন ইঙ্গোআমেরিকান এক নাম-করা বিজ্ঞাপন অফিসের এ্যাসিস্টান্ট জেনারেল ম্যানেজার। আমেরিকা ইওরোপ ঘুরে এসেছিলেন বার দুয়েক। পুরানো আলিপুরে সাহেবদের ছেড়ে যাওয়া বাগান ঘেরা বাংলো বাড়িতে ছিল বাস। ভাড়া গুণতো কোম্পানি। গাড়ি ড্রাইভারের খরচাও পেতেন। বাড়িতে ঝি-চাকরের অভাব ছিল না। পার্টি লেগে থাকতো প্রায়ই। অভাব বিষযটি, শংকর কোনো দিক থেকেই তখন জানতে পারে নি বছরে দু'বার দেশের দূরাঞ্চলে পারিবারিক ভ্রমণ ছিল বাঁধা। আধুনিক সঙ্গতিপন্ন পরিবারের যা কিছু থাকা উচিত সবই ছিল।

শংকরের বাবা ভবনাথ মিত্রকে সেলফ-মেড ম্যান বলা যায়। ওর ঠাকুর্দা ছিলেন সিটি কোর্টের জার্জ। বাবারা তিন ভাই তিন দিকে উন্নতি করেছিলেন, এব কোনো বিবাদ বিসম্বাদ না করেই, তিনজনে আলাদা সংসার করেছিলেন। বাবা বিয়ে করেছিলেন মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে। শংকর যখন বি. এ. পড়ছিল, ওর বড়দা তখন এম. এ. পাশ করে, বাবার অফিসে চাকরি নিয়েছে। বড়দার পরেই দু' বোন ছিল। একজনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। শংকরের পরে ছিল এক বোন, তারপরে এক ভাই।

এই যখন অবস্থা, শংকর অনার্স ডিগ্রি কোর্সের ফার্স্ট পার্ট পাশ করেছে, আর দুনিয়াকে তাক লাগানোর মতো দুর্দান্ত কিছু ভাবছে, তখনই একটি পিনের খোঁচার মতো, ওর রঙীন বেলুনটা ফেটে গিয়েছিল। বাবার স্ট্রোক হয়েছিল অফিসের টেবিলে, এবং হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথেই মারা গিয়েছিলেন। অথচ বাবা ছিলেন কর্মঠ শক্ত মানুষ, অসুখের কোনো লক্ষণই তখনো দেখা যায় নি। এমন কি উচ্চ রক্তচাপের ব্যাধিও ছিল না।

শংকরের রঙীন বেলুন ফেটে যাওয়ার থেকেও, সব থেকে সর্বনাশ যেটা ঘটেছিল, সেটা ছিল গোটা পরিবারের। একটা আলো ঝলমলে ঘরে হঠাৎ অন্ধকার নেমে এলে সবাই যেমন হতচকিত স্তব্ধ হয়ে যায়, ভবনাথের আকস্মিক মৃত্যুতে সেই রকম ঘটেছিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে,

সবাই যেন একটা দম বন্ধ ঘরে আটকা পড়ে গিয়েছিল। কোথায় যাবে, কী করবে, কিছু স্থির করা যাচ্ছিল না। পরিবারের লোকের কান্নাটা অনেকটা ভয়ার্ত আর্তনাদের মতো শুনিয়েছিল। যদিও ভবনাথের অফিসের এবং অন্যান্য বন্ধুরা শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এসেছিলেন। এসেছিলেন তাঁর দুই প্রতিষ্ঠিত দাদা এবং ভাই। কিন্তু একটি মৃত্যু একটি পরিবারের পতনকে কোথায় তলিয়ে দিতে পারে, সে-বিষয়ে সকলে অবহিত থাকলেও, সামাল দেবার ব্যবস্থা কেউই কিছু করতে পারে নি। কোম্পানির গাড়ি কোম্পানিতে ফিরে গিয়েছিল। রাজকীয় বাংলোটি ত্যাগ করার নোটিস এসেছিল তিন মাসের মধ্যে।

ভবনাথের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকার অংকটা কিছু কম ছিল না। কিন্তু টাকা, টাকা আনতে পারে, সে-সব চিন্তা ভাবনা কৌশল, ভবনাথের স্ত্রী বা ছেলেদের কারোর ছিল না। ভবনাথ মিত্রের ওপরেই ছিল পরিবারের যা কিছু ভরসা। টাকা পাওয়া গেলেও, তাঁর শূন্যতা কোনো দিক থেকেই পূরণ করা যায় নি। পরিবারটির পতনের মধ্যেও, তার পুরনো জীবনযাপনটা সহসা অপসারিত হতে পারে নি। শংকরের বড় ভগ্নিপতি কিছু কিছু উপদেশ দিয়েছিল। তার মধ্যে একটি, শংকরের পিঠোপিঠি ছোট বোন প্রতিমার বিয়েটা আগে দেওয়া। মা সেই একটি কাজ যথার্থ বুদ্ধিমতীর মতো সেরে ফেলেছিলেন, বাংলোর তিন মাসের মেয়াদের মধ্যেই। পিতার পারলৌকিক কারণে, শাস্ত্র মতে ছেলেদের বিয়ে বৎসর কালের মধ্যে আটকালেও, কন্যাদায় থেকে মুক্ত হতে বাধা ছিল না। বলতে গেলে, বাবার মৃত্যুর ছ'মাস পরেই, বেশ সাড়ম্বরে প্রতিমার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শংকরের বড়দা পিনাকীর মোটেই ইচ্ছা ছিল না, ঐ রকম সাড়ম্বরে খরচ-খরচা করে প্রতিমার বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মায়ের একটি কথাই ছিল, 'ও যে ভাবে ছোট মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিল, আমি তাই দেবো।' 'ও' অর্থাৎ শংকরের বাবা।

শংকরও বুঝেছিল, মায়ের ওটা সেন্টিমেন্টের কথা। অবস্থার চাপে

পড়ে মানুষকে অনেক কিছুই বদলাতে হয়। মা তা করেন নি। মায়ের কাছে সেটা মোটেই সেন্টিমেণ্টাল ব্যাপার ছিল না। তাঁর স্বামীর ইচ্ছাকে রূপ দেওয়াটাই ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। অবস্থার কথা বিবেচ্য ছিল না। আসলে, কেউ বুঝতেই পারে নি, বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পরেই, মায়ের ভিতরে কতোখানি ক্ষয় ধরেছিল। প্রতিমার বিয়ের পরেই, সেটা বোঝা গিয়েছিল। চাকুরে বলতে ছিল দাদা পিনাকী। শংকরের বি. এ. পাশ করতে তখনও এক বছর বাকি পিনাকি চেষ্টা করেছিল, শংকর যদি বাবার অফিসেই একটা চাকরি পায়। ফার্ম রাজি হয় নি, কারণ সেই সময়ে ফার্মেও নানা রকম ঝামেলা চলছিল। বিপদই বোধ হয় আরও বিপদকে টেনে আনে অন্ততঃ সময় বিশেষে তাই দেখা যায়। ইঙ্গো-আমেরিকান প্রচার " বিজ্ঞাপন ফার্মটিও তখন তার অস্তিত্বের সংকটে পড়েছিল।

প্রতিমার বিয়ের খরচকে কেন্দ্র করে মায়ের সঙ্গে দাদার বিরোধ দানা বেঁধে উঠেছিল শংকর প্রথমে ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি বিরোধটাকে এক পক্ষের বলাই ভালো। দাদার বিরোধ। দাদা, এমন কি মায়ের কাছে টাকা পয়সার হিসাবও চেয়েছিল, এবং বাকি টাকাটা কী ভাবে ভবিষ্যতের জন্য কাজে লাগানো যায়, তা মায়ের সঙ্গে নানা রকম কথাবার্তাও বলতো অথচ দৈনন্দিন সংসার চালানোর বিষয়ে দাদারও যথার্থ কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। সে-ই তখন সংসারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি, কিন্তু বাবার আয়ের তুলনায়, দাদার আয় ছিল তুচ্ছ। মায়ের কাছে গচ্ছিত টাকা জলের মতোই খরচ হয়েছিল।

আলিপুরের বাংলো থেকে, ভবানীপুরের কাঁসারীটোলার দূরত্ব হয় তো তেমন ছিল না। ভবনাথ মিত্রের পরিবারের কাছে সে দূরত্ব অসীম, এক জগত থেকে আর এক অচেনা জগতে প্রবেশের মতো। মায়ের শরীর ভাঙছিল দুরন্ত গতিতে। তাঁর শোক বোঝাবার মতো মনের অবস্থা বোধ হয় কারোরই ছিল না। মানুষ অনভিজ্ঞ হলেও, পক্ষী পতঙ্গ যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পদধ্বনি শুনতে পায়, শংকর সেই রকম একটা কিছু অনুভব করেছিল। ওর মতো উচ্চাশায় অস্পষ্ট

ধ্যান-ধারণা ছিল, বি. এ. পাশ করবার আগেই, সে সব যেন কোথায় তলিয়ে যেতে আরম্ভ করেছিল। এর নাম পশ্চাদ্‌পট, যার কথা ওর আগে কখনো মনে হয় নি। কাঁসারিটোলার বাড়িতে বাস করতে এসে, ধ্যান-ধারণাগুলো হারিয়ে যাচ্ছিল। মা ক্রমাগত রুগ্ন হয়ে পড়ছিলেন। মাকে গ্রাস করেছিল স্বামীর শোক, বাকিদের গ্রাস করেছিল হতাশা।

সন্তান হয়ে ভাবতে হয়তো সেই সময়ে ভালো লাগে নি, আসলে শংকরদের মনে হয় নি, স্বামী বিহীন বিশ্বসংসার মায়ের কাছে অর্থহীন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বিদায় চাইছিলেন, পেয়েও ছিলেন। শংকর কোনো রকমে অনার্স বজায় রেখে পাশ করার, তিন মাসের মুখে মা মারা গিয়েছিলেন অর্থাৎ পনেরো মাসের মধ্যেই, শংকরদের তিন ভাইকে দু'বার কাচা গলায় নিতে হয়েছিল। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গিয়েছিল, মায়ের নামে ব্যাংকে মাত্র আর হাজার দশেক টাকা পড়েছিল। মায়ের অবর্তমানে টাকাটা তোলবার ব্যবস্থা ছিল দাদার নামে দুই ভগ্নিপতি ও কাকা জ্যাঠাদের উপস্থিতিতে, শ্রাদ্ধ শান্তি নমঃ নমঃ করে মেটাতেও, দশ হাজার টাকার বিশেষ কিছু বাঁচানো যায় নি। তারপরে কাঁসারিটোলার তিন ভাইয়ের সংসার, পিনাকি, শংকর আর বিজিত মায়ের মৃত্যুর সময়ে বিজিত সবে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছিল।

নতুনতর সমস্যার শুরু সেই থেকে। পিনাকির একার আয়ে বাড়ি ভাড়া দিয়ে সংসার চালিয়ে, শংকর আর বিজিতকে পড়ানো সম্ভব ছিল না। অগ্রজ হিসাবেও পিনাকির সে মেজাজ বা চরিত্র ছিল না। মা বেঁচে থাকতে, শংকরের ন্যূনতম হাত-খরচাটা জুটতো। তা বন্ধ হয়েছিল। দাদার কাছে হাত পাতার কথা ভাবতেই পারে নি শংকর। অতএব, দুরন্ত স্বপ্নচারী কোনো রকমে জুটিয়ে নিয়েছিল দুটো টুইশানি। বিজিত কলেজে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু ও হয়ে উঠেছিল এক ধরণের অবিনীত আর রাগী। শংকরকে তেমন পাত্তাই দিতো না। দাদা যে নিতান্ত কর্তব্যের খাতিরেই ওকে পড়াচ্ছিল, এবং ও একটা বোঝা, তা বুঝতে পারছিল।

শংকর এখন বুঝতে পারে, উচ্চাকাংখা থাকলে, দাপিয়ে ঝাঁপিয়ে, কলকাতার বুকে একটা স্থান করে নেওয়া যায়, কিন্তু ওর মধ্যে সেই শক্তির অভাব ছিল। অথবা বলা যায়, অল্প সময়ের মধ্যেই, ভাগ্য বিপর্যয় ওকে হতমান করেছিল। দাদার ব্যবহার ওকে কষ্ট দিতো, মুখ ফুটে কোনো দিন বলতে পারে নি অগ্রজের প্রতি কনিষ্ঠের কোনো দাবী থাকতে পারে, সেটা দাদা গোড়া থেকেই যেন মেনে নিতে চায় নি। বিজিতের জন্য ওর মন খারাপ হতো। অথচ ওকে সব দিক দিয়ে আগলে রাখার যোগ্যতা শংকরের ছিল না। দিদি মমতা বা বোন প্রতিমার অবস্থা খারাপ ছিল না। যদিও কলকাতাবাসী কেউ ছিল না। পত্রে কুশল জিজ্ঞাসা ছাড়া কোনো সম্পর্ক ছিল না তাদের সঙ্গে।

শংকরের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। য যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সেটাই স্বাভাবিক নিজেদের তিন ভাইয়ের সংসারের দিকে তাকিয়েই তা বোঝা যাচ্ছিল সংসার বড় কঠিন ঠাঁই, শংকরের এই বোধ জন্মেছিল। হতাশা কাটিয়ে ও নানা ভাবে উঠে পড়ে লেগেছিল। কিন্তু জীবন একবার একটা দিকে মোড় নিলে, সহজে তার গতিরোধ করা যায় না। খবরের কাগজের 'ওয়ান্টেড কলাম দেখে বিস্তর দরখাস্ত পাঠাতে পাঠাতে, ও সাময়িক ভাবে' একটা ইস্কুলে চাকরী নিয়েছিল। ইস্কুলের চাকরিটাও খুব সহজ ব্যাপার না। শহরের বুকে কয়েকটা ইস্কুলে কাজ করতে করতে, ও গিয়েছিল কলকাতার উপকণ্ঠে। সেখানে চাকরি করতে করতেই, বি. টি. পাশ করেছিল

ইতিমধ্যে জল গড়িয়ে গিয়েছিল অনেক। বিজিত কলেজে ঢুকেই রাজনীতি নিয়ে মেতেছিল। লেখাপড়ার থেকে, ক্রমে সেদিকেই ও যেন একটা আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আক্রোশ নিয়ে? হ্যাঁ, শংকরের তো সেই রকমই মনে হয়েছিল। আক্রোশ নিয়ে কোনো কিছুতে ঝাঁপিয়ে পড়ার অর্থই তো, নিজেকে মনের মতো কিছু না পেয়ে একটা কিছুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। ফলে দাদার সঙ্গে বিবাদ। দাদাও দেখছিল, বয়স হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে ও একটি ছোট সংসারের

স্বপ্ন দেখাটা তার পক্ষে দোষের ছিল না। দাদা প্রস্তুত হচ্ছিল। শংকর প্রত্যক্ষ রাজনীতি না করলেও, রাজনীতির ছোঁয়া বাঁচিয়ে বলা সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে, ইস্কুলের শিক্ষকতার জীবনে, রাজনীতি ওকে রেহাই দিতো না, এবং সেই রাজনীতির আবহাওয়াটা ওর মনকে বিমর্ষ করতো, উৎসাহিত করতো না। ও নিজে কলেজ জীবনে রাজনীতি নিয়ে মাতে নি, কিন্তু গতি প্রকৃতি সম্পর্কে একেবারে অনবহিত ছিল না। খবরের কাগজ পড়তো নিয়মিত। বুঝেছিল, বিজিত রাজনীতিকে গ্রহণ করেছে একেবারে রক্তে মাংসে। অথচ শংকর বুঝতে পারছিল, সেখানে ও বেমানান। বরং ওর মনে একটা সংশয়ের জিজ্ঞাসা: জাগতো, নৈরাশ্যই কি শেষ পথ হিসাবে রাজনীতির দিকে ঠেলে দেয়?

তা যদি হতো, শংকরকেও দিতে পারতো তা দেয় নি। এমন না যে, নানা দলে নানা রাজনীতি করে এমন বন্ধু ওর ছিল না। রাজনীতি নিয়ে কথাবার্ত্তা হতো না এমনও না। কিন্তু একটা প্রগাঢ় অনীহা ছিল। বিশ্বাস একটা বড় কথা। তত্ত্বগত দিক থেকে, কোনো মহাপুরুষের লেখাই ওর পড়া ছিল না। সেই হিসেবে ও তাত্ত্বিক হয়েও উঠতে পারে নি। কিন্তু সময় ও সমাজ সম্পর্কে ও নির্বিকার ও অচেতন না। ন্যায় অন্যায় বোধ সম্পর্কে ও অন্ধ ও অনুভূতিহীন না, আর এই সময় সমাজ ন্যায় অন্যায় বোধের কাছে এসেই, রাজনীতি নিয়ে কেমন বিভ্রান্তি বোধ করেছে। দল ছাড়া রাজনীতি করা যায় না, সেটা রাজনীতির হাটে বিকোয় না, ঘরে বসে সৌখীন মজদুরি করা হতে পারে। চারপাশের জীবন, আর রাজনৈতিক দল-গুলোর কর্মসূচী, কাজের ধারাকে ও কিছুতেই মেশাতে পারে নি। সেটা যে ওরই অক্ষমতা, এটা ওকে প্রথম প্রায় চ্যালেঞ্জ করে বলেছিল, ওর অল্প বয়সের বন্ধু প্রিয়ব্রত বিশ্বাস। প্রিয়ব্রতর সঙ্গে কলেজ থেকে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। শংকর জানতো, প্রিয় বিত্তবান পরিবারের ছেলে। কলেজ ছেড়ে আসার পরেও, প্রিয়র সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে, কিন্তু রাজনীতি করতে দেখে নি। বরং পরিবারের বিদেশ চালানের ব্যবসায়ে কিছু কিঞ্চিৎ কাজ করতো, আগের মতোই গাড়ি হাঁকিয়ে বন্ধু বান্ধব নিয়ে হৈ চৈ করে বেড়াতো।

সেই প্রিয়, যার ভাই সুব্রত এই শালচিতি গ্রামে দুর্ঘটনা ঘটালো, একদিন রাত্রে শংকরের কাছে এসে আশ্রয় চেয়েছিল। সময়টা শংকরের ভালো যাচ্ছিল না বিজিত ঘর ছাড়া। দাদা বিয়ে করে সংসার পেতেছে। আটষট্টির শেষ, উনসত্তরের শুরু। প্রিয় তখন আণ্ডারগ্রাউণ্ড পলিটিক্যাল কর্মী, সেই জন্যই আশ্রয়। দাদা প্রিয়কে চিনতো না, কিন্তু বাড়িতে শংকরের ঘরে একজন আশ্রয় নিয়েছে, ব্যাপারটা মোটেই ভালো চোখে দেখেনি। একদিন শংকরকে ডেকে পরিস্কার জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোর ওই বন্ধু কি নকশাল করে? যদি করে তাড়াতাড়ি ও সব ঝামেলা বাড়ি থেকে হটা। নইলে, এ বাড়িতে তুই থাক, আমি চলে যাচ্ছি।'

কাঁসারিটোলার পুরো একটা পাঁচ কামরার দোতলা বাড়ির প্রয়োজন ছিল না। শংকরকেও দাদা পালন করে না। অতএব, ছাড়াছাড়ি হলেও ক্ষতি তেমন ছিল না। শংকরকে অবিশ্যি বাড়িটা ছাড়তেই হতো। সেই সময়ে চারশো টাকা ভাড়া দিয়ে, সেই বাড়িতে একলা থাকার কোনো অর্থই ছিল না। কিন্তু দাদা সেকথা বলে নি। প্রিয়ব্রত তখন নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিল। জড়িয়ে পড়েছিল বললে ভুল বলা হয়। আন্তরিক বিশ্বাস নিয়েই সে নকশাল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। প্রিয়ব্রতর সব চেহারা আলাদা। কথাবার্তা, চোখ মুখের চেহারা। এক কথায় আগুন।

শংকর কেবল অবাক হয় নি, প্রিয়র কাছে সব নিজেকে কেমন নিষ্প্রভ তুচ্ছ মনে হয়েছিল। স্বপ্নচূড়ার থেকেও অধিক, প্রিয় একেবারে বাস্তব, ও ঐশ্বর্যের মীনার চূড়া থেকে নেমে এসেছিল। ওর রাজনৈতিক তত্ত্বে গভীর বিশ্বাস ছিল, তথ্য প্রমাণ ছিল ওর বিস্তর। সেই সময়েই শংকরের জীবন ও ধ্যান-ধারণা শুনে ও বলেছিল, 'তুই অন্ধ। বুর্জোয়া আর মেকি বিপ্লবীদের দেখে আর তাদের ধাপ্পাগুলো শুনে, তোর সব গোলমাল হয়ে গেছে। তোকে অবিশ্যি তার জন্য দোষ দিই না। ধাপ্পাতে অনেকেই ভুলে আছে, যেমন আছে তোর ভাই বিজিত। কিন্তু আমাকে দেখে তো তোর আর দল বেছে নিতে ভুল হবার কথা নয়। আমরা দফাওয়ারি কর্মসূচীর কথা বলে ভোলাই

না, কারণ তার আগে আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চাই বুর্জোয়া পার্লামেন্ট আর সংবিধান আমরা ভেঙে ফেলবো, তারপরেই আমাদের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারবো। চীন আর ভিয়েৎনাম আমাদের পথ দেখিয়েছে।··'

সেই সময়ে কথাগুলো শংকরের কাছে নতুন ছিল না। নানা ভাবেই, দেওয়ালের পোস্টার থেকে, বিভিন্ন কাগজ-পত্রের মাধ্যমে, 'পার্লামেন্ট শুয়োরের খোঁয়াড়' 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' 'লিনপিয়াওয়ের পথ আমাদের পথ' 'হো-চি-মিন যুগ যুগ জীও' ইত্যাদি সবই নানা ভাবে জানা ও শোনা ছিল। কিন্তু প্রিয়ব্রতর মুখ থেকে শোনার ইম্প্যাক্ট আলাদা। শংকরের দ্বিধা দ্বন্দ্ব কেটে গিয়েছিল, ওর বুকে প্রিয়র আগুনের আঁচ লেগেছিল। দল নিয়ে যে ওর মনের মধ্যে নানা রকমের সংশয় ছিল, সেই দলই যেন ও খুঁজে পেয়েছিল। প্রিয়ব্রত আদর্শহীন না, আদর্শের জন্য সে নিরাপদ জীবনের সুখ ঐশ্বর্য সব কিছু ছেড়ে এসেছিল। প্রিয় যদি তা পারে, শংকরের কিসের সংশয়? ওর নিজের ভাই বিজিত হতাশা থেকে রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছিল। প্রিয়র জীবনে কোনো হতাশা ছিল না। আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, মরণ যজ্ঞে ঝাঁপ দিয়েছিল, এবং তার ব্যাখ্যা ও নীতির মধ্যেই ছিল যুক্তি। অন্যান্য দলগুলির প্রতি অবিশ্বাস থেকেই তো অনাস্থা এসেছিল শংকরের মনে। দলবাজীর গ্লানি ছিল না প্রিয়দের মধ্যে। কোন কুটকচালি ছিল না। সবই স্পষ্ট আর খাঁটি। জনগণকে মিথ্যা আশ্বাসের, পাইয়ে দেবার সুড়সুড়ির কথা ছিল না। সোজা কথা, সোজা কাজ। প্রথম ক্ষমতা দখল, তারপরে নতুন রাষ্ট্র গঠন।

চীনের চেয়ারম্যানই তো সারা বিশ্বের চেয়ারম্যান হবার যোগ্য। তাঁর পথ ছাড়া পৃথিবীর সর্বহারাদের মুক্তির পথ আর কী ছিল?

কিন্তু বাড়ির আবহাওয়া ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল। দাদা আর বউদি ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠেছিল, অথচ যেন একটা অলৌকিক ভয়ে তারা বাড়ির মধ্যে মুহ্যমান হয়ে থাকতো। শংকর পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল, 'আমার বন্ধু সময় হলেই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

ও কোনো ক্ষতি করছে না। কিন্তু ওর ক্ষতি কেউ করতে চাইলে, তার পরিণাম হবে মারাত্মক।'

শংকর কথাগুলো এমন ভাবে বলেছিল, পিনাকি আশা করে নি। পিনাকি শংকরকেই ভয় পেতে আরম্ভ করেছিল, আর অন্য একটা বাড়ির সন্ধানে তৎপর হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে, প্রিয়ব্রতর সঙ্গে, শংকরের মারফৎ বাইরে পার্টির যোগাযোগ হয়েছিল। নিজেকে ও একজন কর্মী ভাবতে পেরে, গর্ব অনুভব করেছিল। ওর আটাশ বছর বয়সটা ফিরে পেয়েছিল আঠারোর আগুন। কিন্তু প্রিয়ব্রতর কঠিন নির্দেশ ছিল, শংকর যেন কোনো রকমেই, আচরণে, কথাবার্তায় আইডেন্টিফায়েড হয়ে না যায়। ও যেমন সাতে পাঁচে না থাকা ইস্কুল মাস্টারের জীবনযাপন করছিল, ঠিক তাই করে যাবে, তার এক চুলও এদিক ওদিক না হয়। তা না হলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। এমন কি ও যদি কোনো দিন কোনো কারণে ধরাও পড়ে যায়, তা হলে যেন সব বেমালুম অস্বীকার করে। মেরে ফেললেও একটি কথাও স্বীকার করা চলবে না। সামান্য সূত্র থেকে অসামান্য ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

শংকর ওর নেতার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছিল। কিন্তু, মাসখানেক পরেই, একদিন একটা দমকা ঝড়ে যেন সব ছত্রাখান হয়ে গিয়েছিল। বিজিত ঘর ছাড়া মানে এই ছিল না, ও চিরদিনের জন্য গৃহত্যাগ করেছিল। ও ওর বড়দা মেজদার ঘাড়ের বোঝা হতে চায় নি, এই ছিল ওর স্পষ্ট কথা। সেইজন্যই নিয়মিত বাড়িতে থাকতো না। কিন্তু দমকা বাতাসের মতো দু-চার মাসে হঠাৎ হঠাৎ ওর আবির্ভাব ঘটতো। বড় জোর একটা বেলা, বা এক রাত থেকেই চলে যেতো। প্রিয়ব্রতর মতো ওরও ছিল এক মুখ গোঁফ-দাড়ি, শক্ত মুখে কঠিন দৃষ্টি। সামান্য দু-চারটি কথা, যা একান্ত না বললে নয়, তাই বলতো। বড়দার সঙ্গে আদৌ কথা বলতো না। বউদি তো ওর কাছে একজন অচেনা মহিলা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। শংকরই ওকে বাড়িতে থাকতে বলতো। সে অধিকারও ওর ছিল। কারণ ও সংসারের কিছু খরচ বহন করতো। কিন্তু

বিজিতের পরিষ্কার জবাব ছিল, 'আমার জায়গা আমি বেছে নিয়েছি, তোদের সঙ্গে আমার থাকার কোনো প্রশ্নই নেই মেজদা। আমার জগত আলাদা। তবু এদিকে এলে, তোদের কাছে একবার না এসে পারি না। এখানে কী আছে? বড়দা চাকরিতে উন্নতি করার চেষ্টায় আছে। তুই একটা নেহাত ইস্কুল মাস্টারের জীবন কাটাচ্ছিস। আমি আমাদের পার্টি সংগঠনের কাছে ঘুরে বেড়াই। আমাদের যুক্তফ্রণ্টের আঁতাতটা মার খাচ্ছে, কিন্তু চিরদিন এ রকম থাকবে না, চলবে না। বিশ্বাসঘাতকগুলোর মুখোশ একদিন খুলবেই, মানুষকে চিরকাল ধাপ্পা দেওয়া যায় না। আমি একস্ট্রিমিস্ট নই, দক্ষিণপন্থী আপোষবাদীও নই। খাঁটি নীতি যদি কিছু থাকে, আমাদেরই আছে।...তুই আমার জন্য ভাবিসনে মেজদা, আমি আমার জায়গা খুঁজে নিয়েছি। তোদের সঙ্গে আমার কোথাও মিল নেই। তবে হ্যাঁ, কিছু মনে করিস না মেজদা, আই পিটি ইউ। তুই কী ছিলি, কী হয়ে যাচ্ছিস।'

শংকর নিজেকে একেবারে জানতো না, তা না। সবই তো সেই পশ্চাদপট, চালচিত্র সরে যাওয়ার পরেই, ন্যাড়া প্রতিমাগুলোর দুর্ভাগা চেহারা বেরিয়ে পড়েছিল। বিসর্জনের আগের ছবি। সেই ভাঙনটা তো দেখা দিয়েছিল সব দিক থেকেই। বিজিত শংকরকে করুণা করতে পারে, ওর পরিণতিও সেই ভাঙন থেকেই। ভবনাথ মিত্রের তিন বংশধর, তিন দিকে ভেসেছিল। কিন্তু বিজিতের দাবী ছিল, ও ঠিক পথ বেছে নিয়েছে। শংকর প্রতিবাদ করে নি। পিনাকি তো কেবল দায়মুক্ত হতেই চেয়েছিল। তথাপি শংকর তিন ভাইকে নিয়ে একটা সংসার গড়ে তোলবার স্বপ্ন দেখতো, যা ছিল অসম্ভব। সে কারণে ও দাদা বউদির সঙ্গেও সহজে জীবনযাপন করতে চেয়েছিল। ও একেবারে বিচ্ছিন্ন হতে চায় নি।

কিন্তু সেই বিচ্ছিন্নতাই অনিবার্য করে তুলেছিল প্রিয়ব্রতর আগমন। ও যখন নতুন ভাবে জীবনকে দেখতে আরম্ভ করেছিল, তখনই হঠাৎ একদিন বিজিতের আবির্ভাব হয়েছিল। একটা কথা প্রিয় প্রায়ই বলতো, 'শংকর, তো আশ্রয়টা আমার কাছে সবদিক থেকেই নিরাপদ। তোর দাদা বউদিকে ভয় পাই নে, ওদের তুই ম্যানেজ

করেছিস। কিন্তু বিজিত কোনো দিন এসে পড়লে, জানতে পারলেই সব গোলমাল হয়ে যাবে।'

শংকরের আশা ছিল বিজিত এলেও, প্রিয়ব্রতকে ও আড়াল করে রাখতে পারবে। পারে নি। হঠাৎ এক রবিবারের সন্ধ্যায় বিজিত বাড়ি এসে উপস্থিত হয়েছিল। প্রিয় দিনের অধিকাংশ সময় দোতলার একটা ঘরে থাকতো। রাত্রের অন্ধকারে চিলেকোঠায় আর ছাদে যেতো। বাড়িতে সর্বক্ষণের কাজের লোক বলতে একজনই ছিল। বাবার আমলের একজন পুরনো বয়স্ক লোক, সে প্রায় শংকরদের সবাইকেই বড় হতে দেখেছে। সে-ই একমাত্র পুরনো বেতনে, খাওয়া পরা নিয়ে, এ বাড়ির আশ্রয় ছেড়ে যায় নি। তার নিজের কেউ ছিল না। মিত্র পরিবারের ছেলেদের ওপর কিছু টানও ছিল। বিজিতকে দরজাটা খুলে দিয়েছিল সে-ই। বিজিত কেবল জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ভালো আছো কেমন চাচা?' জবাব শোনারও অপেক্ষা করে নি। দাদা বউদি গিয়েছিল সিনেমায় শংকর আর প্রিয়ব্রত তখন দোতলার ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছিল। কাঁধে ব্যাগ, বিজিত এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে।

আকস্মিকতার চমকটা মুখে ফুটে উঠেছিল শংকর আর প্রিয়ব্রতরই বেশি। বিজিতের চোখে ছিল বিস্ময় ও সন্দেহ। শংকর তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে বলেছিল, 'বিজ্? কখন এলি?'

বিজিত তখন প্রিয়ব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। না চেনার কথা না। আলিপুরের বাড়িতেই অনেকবার দেখেছে। তবু অনেকগুলো বছর কেটেছিল। প্রিয়ব্রতর মুখে ছিল গোঁফ দাড়ির জঙ্গল। তবু ঠিক চিনে নিয়েছিল, বলেছিল, 'প্রিয়দা না?'

প্রিয়ব্রত সহজ হতে পারে নি, কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ। তুমি তো বিজিত?'

'চিনতে পেরেছেন দেখছি।' বিজিতের চোখে তখনও সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা, 'আপনিও দেখছি গোঁফ দাড়ি রেখেছেন।'

শংকর হেসে বলেছিল, 'প্রিয়র ওটা সখ। আজ বিকেলে হঠাৎ আমার কথা এর মনে পড়েছে, তাই দেখা করতে এসেছে। তুই আজ থাকবি তো?'

'হ্যাঁ, রাতটা থাকবো বলেই তো এসেছি।' বিজিত বলেছিল, কিন্তু ওর চোখের সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা জেগেইছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাড়ির কর্তাগিন্নি কোথায়? দেখলাম না তো?'

শংকর বলেছিল, 'দাদা বউদির কথা বলছিস? সিনেমায় গেছে। চা-টা কিছু খাবি না কি? বেচনচাচাকে তা হলে বলে দে।'

'খেলেও চলে, না হলেও চলে।' বিজিত পাশের ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোরা কি কোথাও যাচ্ছিলি?'

শংকর বলেছিল, 'ছাদে বসে গল্প করবো ভাবছিলুম। তুই আসবি নাকি?'

বিজিত মুখ তুলে প্রিয়ব্রতর দিকে তাকিয়েছিল। গোঁফের ফাঁকে একটু হেসে বলেছিল, 'প্রিয়দা যেন আমাকে ভুল দেখার মতো দেখছেন। তোদের বোধ হয় কোনো গোপন কথা আছে। তোরা যা।' ও অন্য ঘরে ঢুকে আলো জ্বালিয়েছিল, দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

এক সময়ে ও ঘরটা বিজিতেরই ছিল, এখনও আছে। নীচের তলাটা পুরো দাদা বউদির দখলে। শংকর আর প্রিয়ব্রতর মুখে উদ্বেগ, সন্দেহ, কিন্তু চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছিল। শংকর চোখের ইশারায় ওকে শান্ত আর স্বাভাবিক হতে বলেছিল। জবাবে প্রিয়ব্রত বলেছিল, 'থাক ছাদে আর যাবো না, ঘরে বসেই গল্প করি।'

প্রিয়ব্রত দ্রুত ঘরে ঢুকেছিল। শংকরও। প্রিয় ঘরের কোণে সরে গিয়েছিল, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী মনে হয় তোর শংকর? ও কি এমনি এসেছে,' না কোনো খবর পেয়ে?'

'আমার মনে হয় এমনি, যেমন হঠাৎ এসে পড়ে।' শংকর জবাব দিয়েছিল, 'ও তোকে দেখে খুব অবাক হয়েছে।'

প্রিয় বলেছিল, 'ও একটা কিছু সন্দেহ করেছে। আমাকে এ ভাবে দেখবে, ভাবে নি। ওর চোখের চাউনিটা মোটেই ভালো নয়। আমাকে আজ রাত্রেই এ বাড়ি ছাড়তে হবে।' .

'তা কেন?'

'তা ছাড়া? আমাকে কাল সকালে দেখতে পেলেই সব বুঝে ফেলবে।'

'আমি তোকে চিলেকোঠায় লুকিয়ে রাখবো।'

'তোর দাদা বউদি কি বেচনচাচা বলে দিতে পারে।'

'ওদের সঙ্গে বিজ কোনো কথাই বলবে না।'

প্রিয়ব্রত খাণিকক্ষণ চুপ করে ভেবেছিল, তারপরে দৃঢ় ভাবে মাথা নেড়ে নিচু স্বরে বলেছিল, 'না শংকর, আর চাপাচাপি সম্ভব নয়। বিজিত আমাকে চিনতে পেরেছে, সন্দেহ করেছে, আমি আজকাল কী করছি না করছি, খবর পাবেই।'

শংকর হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারে নি। কারণ প্রিয়ব্রতর সন্দেহটাও একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে নি। ও নিজেও বুঝেছিল, এক মুখ গোঁফদাড়িশুদ্ধ প্রিয়ব্রতকে এ বাড়িতে দেখে বিজিত কিছু একটা সন্দেহ করেছে, সহজ ভাবে নিতে পারে নি। ছোট ভাই হলেও, শংকরের কাছে বিজিত সেই সময়ে অনেকটাই অচেনা। বিজিতকে বুঝে ওঠা ওর পক্ষে মুশকিল ছিল।

প্রিয়ব্রত আবার বলেছিল, 'তোর বা আমার কারোরই কোনো বিপদের ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। পার্টির ক্ষতি হয়ে যাবার চান্স আছে। তুই যেমন বলেছিস, আমি বিকালে তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, সেই রকম ভাবেই আমি চলে যাবো। আমি বরং তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিই। জামা কাপড় তো আমার তেমন কিছুই নেই। তার আগে কাগজপত্র যা আছে, সব খুঁটিয়ে দেখে ব্যাগে ভরে ফেলতে হবে।'

'কিন্তু, হঠাৎ কোথায় যাবি?' শংকর উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'একটা জায়গা ঠিক না করে কি হঠাৎ এ ভাবে বেরিয়ে পড়া উচিত হবে?'

'হবে। কোথায় যাবো, আমি ঠিক করে ফেলেছি। তুইও আমার সঙ্গে যাবি। তারপরেই তোর কাজ হবে, ইস্কুলে যে-কমরেড রোজ তোর সঙ্গে দেখা করে, তাকে আমার ঠিকানাটা জানিয়ে দেওয়া।'

'আর আমি কী করবে?'

'তোকে ঠিক সময়ে নির্দেশ দেওয়া হবে। আর দেরি নয়, গোছগাছ শুরু করে দেওয়া যাক।'

শংকরের মনে হয়েছিল, প্রিয়ব্রত খানিকটা ভয়ও পেয়েছে। সেটাই হয় তো স্বাভাবিক। দরজা বন্ধ করে ওরা দুজনেই ঘর তন্ন তন্ন করে যতো কাগজপত্র ছিল সব ব্যাগের মধ্যে তুলে ফেলেছিল। প্রিয়র সামান্য জামা কাপড় ঠেসে ভরা হয়েছিল। ব্যাগের মধ্যে। দুজনে যখন নিশ্চিন্ত হয়েছিল, ঘরের মধ্যে সন্দেহজনকে কোনো কিছুই আর নেই, দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। বেরোবার মুখেই বিজিত ওর ঘরের দরজা খুলেছিল। তখনও ওর চোখে সন্দেহ। শংকর বলেছিল, 'বিজু তুই আছিস তো? আমি প্রিয়কে একটু এগিয়ে দিয়ে আসছি।'

'বাড়ির বাইরে কিন্তু প্রিয়দার গাড়ি দেখতে পাই নি।' বিজিত বলেছিল, 'আপনি গাড়ি ছাড়াই এসেছেন?'

প্রিয়ব্রত বলেছিল, 'হ্যাঁ, সব সময় তো আর হাতের কাছে গাড়ি পাই নে। চলি।' বিজিত কথা না বলে ঘাড় কাত করেছিল। কিন্তু ওর চোখে সেই একই সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা। শংকর প্রিয়ব্রতকে নিয়ে নিচে নেমে এসে, বেচনচাচাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বিজিত কিছু জিজ্ঞেস করেছিল কী না। বেচন সাদা ঝোলা গোঁফে ফোকলা দাঁতে হেসে মাথা নেড়েছিল, 'বিজু বেটা তো কোন কথাই বলে না।'

শংকর বলতে চেয়েছিল, বিজিত প্রিয়ব্রত সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে যেন কোনো কথা না বলে। প্রিয়ব্রত ইশারায় বাধা দিয়েছিল, এবং বাড়ির বাইরে বেরিয়ে বলেছিল, 'কোনো লাভ নেই শংকর। আমি বলেছি, বিজিত ব্যাপারটা জানবেই। এরপর তোকেই সব থেকে বেশি সাবধান থাকতে হবে।'

শংকর প্রিয়ব্রতকে ট্যাক্সিতে গড়িয়ায় এক বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছিল। দাদা বউদির খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বেচন জানিয়েছিল বিজিত খেয়ে নিয়েছে। শংকরকে একলা দেখে সে জানতে চেয়েছিল, তার বন্ধু কোথায়? শংকর বলেছিল, ওর বন্ধু আর আসবে না, এবং জিজ্ঞেস করেছিল, বিজিত ওর বন্ধু সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়েছে কী না? বেচন সরল ভাবেই বলেছিল, হ্যাঁ, এবং সে বলেছে, শংকরের বন্ধু এক মাস ধরে এ বাড়িতেই আছে। শংকরের

বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠেছিল। প্রিয়ব্রতর কথা শোনা ওর উচিত হয়নি। বেচনকে বারণ করাই উচিত ছিল। ও বুঝতে পারছিল না, বিজিত কী ক্ষতি করতে পারে। কোনো রকমে মুখে দুটো গুঁজে ও ওপরে উঠেছিল। বিজিত ওর জন্যই ঘরের বারান্দায় অপেক্ষা করছিল। ওকে দেখেই হেসে বলেছিল, 'প্রিয়দা আমাকে দেখেই সরে পড়লেন?'

'সরে পড়ার কী আছে?' শংকর বলেছিল, 'ওর দরকার পড়েছে, তাই চলে গেছে।'

বিজিত তবু হেসেছিল, 'আমি অবিশ্যি প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম। তবু তুই বললি আজ বিকেলে প্রিয়দা তোর কাছে এসেছে। বেচন-চাচার মুখে শুনলাম, প্রিয়দা মাসখানেক এ বাড়িতে আছে। তার মানে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড শেলটার নিয়েছিল তোর কাছে। শেষ পর্যন্ত প্রিয়দাও নকস্থ?'

'নকস্থ মানে?'

'নক্সভমিকা—ওষুধের নাম শুনিস নি? তুইও কি ওই চিকিৎসায় আছিস নাকি?'

শংকর সহসা রাগে না, কিন্তু বিজিতের কথায় ওর কেমন জ্বালা ধরে গিয়েছিল, বলেছিল, 'তোর সঙ্গে আমি ও সব নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই না।'

'তা না বললি, কিন্তু সত্যি মেজদা, তুই, প্রিয়দা, তোদের আমি বুঝতে পারি নে। অনেক নকশাল ছেলেকে বুঝতে পারি, তারা কেন হঠকারী রাজনীতির পথে গেছে। কিন্তু তুই বা প্রিয়দা, তোরা কেন এ পথ নিয়েছিস?'

'কারা হঠকারি আর কারা নয়, এক সময়ে প্রমাণ হয়ে যাবে।'

'তা তো যাবেই। তবে তুই ভুল করেছিস। আসলে এটাও এক রকমের রোমান্টিক ঝোঁক, হঠাৎ মাথায় বিপ্লবের পোকার কিলবিলোনি। খুব বাজে ব্যাপার। বিপদে পড়ে যাবি।'

'কিসের বিপদ? তুই ধরিয়ে দিবি আমাকে?'

'না, আমি তোকে ধরাবো না, তোরাই হয় তো এবার আমার পেছনে লাগবি। প্রিয়দা হয় তো আমার পেছনে তোকেই লাগিয়ে

দেবে। আমি অবিশ্যি আর এ বাড়ি আসবো না, আমাকে খুঁজে পাবি না। তবে কে বলতে পারে, ইন ফিউচার, তোতে আমাতেই হয় তো লড়াই লাগবে। তোদের সঙ্গে কোনো দিনই আপোষ সম্ভব নয়।'

'তোদের দলকেও তো চিনি, নামে বামপন্থী, আসলে দক্ষিণপন্থী রিভিসনিষ্ট। আমরাও কি তোদের সঙ্গে আপোষ করবো ভেবেছিস?'

বিজিত হেসে বলেছিল, 'সত্যি মেজদা, তোর মুখে রাজনীতির কথা শুনতে হচ্ছে, ভাবা যায় না। এর পরে কোন্ দিন পিনাকি মিত্তিরও (বড়দা) রাজনীতির কথা বলবে।'

'তুই ভেবেছিলি, রাজনীতিটা এ বাড়ির ছেলেদের মধ্যে তোর একচেটিয়া।'

'কিন্তু আমি আমার দল চিনে নিয়েছি, সব রকমের সুবিধাবাদের বিরুদ্ধেই আমরা লড়বো।'

বিজিতের চোখ দুটো এক মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠেছিল, তারপরে আবার হেসে বলেছিল, 'ঠিক আছে, ভবিষ্যতে তোর সঙ্গে মোকাবিলা হবে। তবে তোকে একটা কথা বলে রাখি, তোর আর প্রিয়দার বিষয়ে আমি কারোকে কিছু বলবো না, অবিশ্যি যদি বুঝি, তোরা আমার পেছনে লাগিস নি।'

শংকর বিজিতের সঙ্গে কথাবার্তার বিষয় সবই সেই রাত্রে নোট করেছিল। পরের দিন ইস্কুলে ওর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষী দূতের মারফৎ প্রিয়ব্রতকে নোট পাঠিয়ে দিয়েছিল। বিজিতের সঙ্গে ওর অনেক কাল আর দেখা হয় নি। কিন্তু প্রিয়ব্রতর সঙ্গেও আর কখনোই দেখা হয়নি। পার্টির সাংগঠনিক নীতি, আদর্শ, কার্যক্রম, সবই ও জেনেছিল কাগজের লেখায়, প্রিয়ব্রতর মুখে, কিন্তু আণ্ডার গ্রাউণ্ড পার্টির দু-তিনজন কমরেডের সঙ্গে যোগাযোগ ও দূতের কাজ করা ছাড়া, আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ছিল না। অথচ ও জানতো, একদিন ওর ডাক আসবে, ওর প্রতি নির্দেশ আসবে, ইস্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়ে, ওকেও চলে যেতে হবে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। সেই দিনটির জন্য ও মনে মনে অধীর ভাবে প্রতীক্ষা

করেছিল। প্রিয়ব্রত এ রকম একটা ধারণা ওকে দিয়েছিল, যে কোনো সময়েই পার্টির নির্দেশে ওকে চলে যেতে হতে পারে কোনো দূরের গ্রামে। বন্দুক হাতে করতে হতে পারে, শত্রুর বিরুদ্ধে এ্যাকশনে নামতে হতে পারে। প্রাণ নিতে হবে, প্রাণ দেবার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে।

শংকর নিজেকে সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত করেছিল। কারণ ও সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস করেছিল, নিজের পার্টিকেই একমাত্র খাঁটি বিপ্লবী পার্টি বলে গ্রহণ করেছিল। বাকিগুলো সবই সুবিধাবাদী, বুর্জোয়া সাংবিধানিক আওতায় থেকে, জনসাধারণকে ধোঁয়া দেবার দল। কিছু করবার জন্য ওর বুকের মধ্যে দপ দপ করছিল, আগুন লেগেছিল প্রাণে। কিন্তু কোনো ডাক আসে নি ওর কাছে, নির্দেশও আসে নি। যাদের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ছিল, আস্তে আস্তে তারা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা বোধ করছিল। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে একদিন গড়িয়ায় চলে গিয়েছিল প্রিয়ব্রতর সঙ্গে দেখা করতে। রাত্রের অন্ধকারে প্রিয়ব্রতকে পৌঁছে দিলেও বাড়িটা চিনতে ওর ভুল হয় নি। কিন্তু ও অবাক হয়ে দেখেছিল, সে-বাড়ির বাসিন্দা আলাদা। প্রিয়ব্রত রাখতে গিয়ে যে দু-একজনের মুখ দেখেছিল, তারা কেউ ছিল না, বরং অচেনা শংকরকে দেখে, সেই বাড়ির লোকেরা অবাক সন্দেহে ওর দিকে তাকিয়েছিল। শংকর প্রিয়ব্রতর নাম উচ্চারণ করতে পারেনি, কিছু প্রিয়ব্রতকে পৌঁছে দেবার দিন যাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, সেই ধীরেশদার নামটা বলেছিল। জবাব পেয়েছিল, কয়েকদিন আগেই ধীরেশবাবুরা বাসা বদল করে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন, নতুন ভাড়াটেরা বলতে পারে নি।

আশ্চর্য! প্রায় দেড় মাসের জীবনটাকে একটা ভৌতিক বলে মনে হয়েছিল। যেন আদৌ ওর সঙ্গে পার্টি'র কোনো যোগাযোগই হয়নি! অথচ যোগাযোগ করা যায় কেমন করে, তা ওর জানা ছিল না। ও তীক্ষ্ণ চোখে রাস্তাঘাটে লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতো। সেই দু-তিনজন কমরেড বা প্রিয়ব্রতকে যদি

হঠাৎ দেখতে পায়। প্রিয়ব্রতদের বালিগঞ্জের বাড়িতেও যাওয়া ওর নিষেধ ছিল। পার্টি'র কোনো নিষেধ ও কখনো অমান্য করে নি। ও বোকা ছিল না। আস্তে আস্তে বুঝতে আরম্ভ করেছিল, পার্টি ওকে ত্যাগ করেছে। কিন্তু কেন, তার কোনো জবাব কোনো কালেই পায় নি।

ইতিমধ্যে, সত্তর সালের মাঝামাঝি দাদা পিনাকি আলাদা বাসা ভাড়া করে বউদিকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। শংকরকে আগেই তা জানানো হয়েছিল। ও কলকাতার উত্তরের উপকণ্ঠে, ওর ইস্কুলের এক মধ্যবয়স্ক অংকের মাস্টারমশাই মহিমবাবুর বাড়িতে পেয়িং-গেস্ট হিসাবে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। মহিমবাবু গরীব, তবে বাড়িটা ছিল পৈতৃক, তিন ভাইয়ের শরিকানায় ভাগাভাগি। বাইরের ঘরের পার্টিশন করা এক ফালিতে ও স্বচ্ছন্দেই বাস করতো। বাথরুম যাওয়া বা খাবার জন্য বাড়ির ভিতরে যেতে হতো। আসন পেতে মাটিতে কাঁসার থালায় খাওয়া, মহিমবাবুর স্ত্রী তিন সন্তানের জননী হাসি খুশি সরল মহিলা, ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা, মাস্টারমশায়ের দেশ কাল শাসন শিক্ষা নিয়ে সব সময় নানান কথা, সব মিলিয়ে, সেই পরিবেশে শংকর নিজেকে ভালোই মানিয়ে নিয়েছিল। অথবা বলা যায়, মানিয়ে নেবার কথা ওর আদৌ মনেই আসে নি। জীবনধারণ করতে হবে, করছিল।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে সর্বদিক থেকে বিচ্ছিন্নতা ওকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছিল। সপ্তাহে একদিন দাদার সঙ্গে দেখা করতে যেতো। আগের তুলনায় দাদা বউদির আচরণ কিছুটা আন্তরিক হয়েছিল। বিজিতের কথাও মনে পড়তো, আর পড়লেই, ওকে প্রিয়ব্রতর এবং পার্টির বিনা নোটিসে ত্যাগ করার যন্ত্রণাটা বেশি তীব্র হয়ে বাজতো। প্রায়ই রাজনৈতিক খুনোখুনির সংবাদ কাগজে বেরোতো। উত্তরের উপকণ্ঠেও ঘটনা ঘটতো। ওর চোখের সামনে প্রিয়ব্রত এবং সেই দু-তিনজন কমরেডের মুখ ভেসে উঠতো।

সেই সময়টা সত্তরের শেষ দিক। টিফিনের সময় একদিন এক ভদ্রলোক, দরকারী কথা আছে বলে, শংকরকে ইস্কুলের বাইরে ডেকে

নিয়ে গিয়েছিল। ও নিতান্ত কৌতূহল বশতঃই গিয়েছিল। মনে মনে একটা সন্দেহও ছিল, পার্টির কেউ কী না। বাইরে একটা জীপ অপেক্ষা করছিল। লোকটি ওকে জীপে উঠতে বলেছিল। ও আপত্তি করেছিল, কারণ লোকটিকে চেনে না, ইস্কুলও তখন শেষ হয় নি। কিন্তু ওকে চমকিয়ে দিয়ে, লোকটার সঙ্গের আর একজন হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে, ওকে জীপে তুলে নিয়েছিল। জীপ গিয়েছিল থানায়। প্রথমে হাজতে। সন্ধ্যার পরে জিজ্ঞাসাবাদ। শংকর সাবধান হয়েছিল। যদিও গোলমালটা কোথা থেকে কী ঘটেছে, প্রথমে বুঝতে পারে নি। নাম-ধাম পরিচয়, কোনো কথাই অস্বীকার করে নি। এমন কি প্রিয়ব্রত বিশ্বাস যে ওর বন্ধু, এক সঙ্গে পড়েছে, সব কথাই বলেছিল। তারপরেই অস্বীকারের পালা। প্রিয়ব্রতকে আপনি শেলটার দিয়েছিলেন? পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ কত দিন? ছ'জনের নাম জিজ্ঞেস করেছিল, যার মধ্যে তিনজনকে শংকর চিনতো। এখন কার কার সঙ্গে যোগাযোগ আছে?

শংকরের সবগুলো জবাবই ছিল, নেই। দিই নি। চিনি না। তিন দিন জিজ্ঞাসাবাদ চলেছিল। ওরা এ কথাও বলেছিল, শংকর সম্পর্কে ওদের বিশ্বাস আছে, ও পার্টি করে না, কিন্তু যোগাযোগ থাকলে স্বীকার করা উচিত। শংকরের জবাবের কোনো হেরফের হয় নি। ওরা বলেছিল, প্রিয়ব্রতর মুখেই ওরা শংকরের কথা শুনেছে। প্রিয়ব্রত পার্টি ছেড়ে দিয়েছে, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই ভারতবর্ষের বাইরে চলে যাবে! বলা বাহুল্য শংকর কোনো কথাই বিশ্বাস করে নি। তৃতীয় দিনে ওর ওপর দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল। গলা থেকে মাথা বাদ দিয়ে, প্রায় সারা গায়ে, খালি হাতে আর মোটা রুল দিয়ে পিটিয়েছিল। দুই উরুতের মাঝখানে লাথি মেরেছিল। মুখে থুথু দিয়েছিল। সেই দিনই রাত্রি এগারোটার সময় আবার হাজতের বাইরে এনেছিল। সারা গায়ে তখন অসহ্য ব্যথা, জ্বরের ঘোরের একটা আচ্ছন্নতা। ও দেখেছিল, অফিসের একটা ঘরে প্রিয়ব্রত বসে আছে। গোঁফ দাড়ি কামানো পরিষ্কার মুখ, গায়ে আগের মতোই ফিটফাট পোশাক। বলেছিল, 'শংকর, আমি পার্টি ছেড়ে দিয়েছি!

তুই তো আমার জন্যই পার্টিতে এসেছিলি, তুইও ছেড়ে দে। এখন বুঝেছি, আমরা ভুল পথে চলেছিলাম। সতু, মদন, সুহাসের সঙ্গে তোর যোগাযোগ থাকলে বলে দে। আমার সঙ্গে আর নেই। তারপরে বণ্ড দিয়ে বেরিয়ে যা। আসলে আমি বলতে চাই চাইছি, এ সব তোর আমার জন্য নয়।'

শংকর লাল ঘোলা চোখে প্রিয়ব্রতর দিকে তাকিয়েছিল। ও অবাক হয় নি বললে মিথ্যা বলা হয়। কিন্তু তার থেকে বেশি, ও মনে মনে হিংস্র হয়ে উঠেছিল। সেই প্রথম ওর হিংস্রতার অনুভূতি, এবং ঘৃণা। না, ও প্রিয়ব্রত ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নি, বরং শান্ত ভাবে বলেছিল, 'কী সব আবোল তাবোল বকছিস। কিসের পার্টি, তোর সঙ্গে কিসেরই বা যোগাযোগ? ও সব যাদের নাম বললি, কখনো শুনি নি, চিনিও না।'

প্রিয়ব্রত অবাক হেসেছিল, 'তুই দেখছি একেবারে লাইনে কথা বলছিস। শোন, এরা (পুলিশ) জানে, তোর কোনো এ্যাকটিভ রোল্ নেই, এ্যাকশনের মধ্যে নেই, কিন্তু ক্যুরিয়রের কাজ হয় তো চালিয়ে যাচ্ছিস। আমার একটা দায়িত্ব আছে, আমি তোকে পার্টিতে এনেছিলাম। সেই জন্যই বলছি, যোগাযোগ থাকলে বলে দে। নইলে এরা তোকে ছাড়বে না। আমি তোকে অনুরোধ করছি। সময়টা খুব খারাপ, এক কথায় ডেঞ্জারাস। মুখ না খুললে ভয়ংকর কিছু ঘটে যেতে পারে—মানে তোর লাইফ—।'

'তোর সঙ্গে আমার আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।' শংকর বলেছিল, 'আমি তোর কথার এক বর্ণও বুঝতে পারছি না। তোর সঙ্গে কলেজে পড়েছি, এই পর্যন্ত। বাদ বাকি এ সব কী কথা, কী ঘটছে আমি কিছুই জানি না।'

ঘরের মধ্যে দুজন সাদা পোশাকের অফিসার ছিল। প্রিয়ব্রত তাদের দিকে অসহায় চোখে তাকিয়েছিল। একজন অফিসার বলেছিল, 'বুঝেছি। মিঃ বিশ্বাস, আপনার যা কাজ ছিল, তা হয়ে গেছে। আপনি চলে যান।'

প্রিয়ব্রত তবু দ্বিধা করেছিল, ডেকেছিল, 'শংকর।'

শংকর মুখ তোলে নি, তাকায় নি। প্রিয়ব্রতর মুখে ওর থুথু দিতে ইচ্ছা করছিল। প্রিয়ব্রত বেরিয়ে গিয়েছিল, অফিসার তুজনও। কয়েক মিনিট পরেই এই গাড়ি চলে যাবার শব্দ শোনা গিয়েছিল। অফিসার তুজন আবার ঘরে ঢুকেছিল। সঙ্গে আর একজন, ধুতি আর শার্ট পরা, মাথায় ছোট চুল, চওড়া গোঁফ, বেঁটে খাটো শক্ত শরীর। সে প্রথমেই শংকরকে চেয়ার শুদ্ধ লাথি মেরে মেঝেয় ফেলে দিয়েছিল। শংকর ছিটকে পড়েছিল। লম্বা শরীরটা গুটিয়ে গিয়েছিল। তারপরে কেবল লাথি। গোটা ঘরের মধ্যে, লাথি মেরে মেরে, ঘরের এক পাশ থেকে আর এক পাশে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। মুখ মাথাও বাঁচানো যায় নি লোকটার খালি পায়ে শক্তি ছিল। কতক্ষণ বাদে জ্ঞান হারিয়েছিল, শংকর মনে করতে পারে না।

তারপরেও তিন দিন জিজ্ঞাসাবাদ চলেছিল। সতু, মদন, সুহাস কোথায়? জানি না। আবার থার্ড ডিগ্রি মেথড প্রয়োগ। শংকর জ্ঞান হারাবার আগে পর্যন্ত ভাবতো, কোথায় আছে ওরা? সতু, মদন, সুহাস? ঠিক জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে আছে তো? ওরা কি জানে প্রিয়ব্রত বিশ্বাসঘাতক? ওরা কি শংকরের খবর রাখে? না রাখলেও ক্ষতি নেই ওরা ঠিক থাকলেই হলো।

শংকর ধরেই নিয়েছিল, ওকে খুন করা হবে। কিন্তু হয় নি। ওকে পরের পাঁচদিন আর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় নি, মারাও হয়নি। ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হাসপাতালে। চব্বিশ ঘণ্টা পুলিশের নজরবন্দী অবস্থায় চিকিৎসা করা হয়েছিল। হাসপাতাল থেকে শেয়ালদা কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে। অভিযোগ, পুলিশের ওপর সশস্ত্র হামলা, বোমাবাজী। একটা পাইপগান প্রডিউস করা হয়েছিল। শংকর অপরাধ অস্বীকার করেছিল। কোর্টে দাদা পিনাকি এসেছিল, উকিল দিয়েছিল। জামিন মেলে নি, তিন মাস পরে তারিখ পড়েছিল। কোর্ট থেকে আলিপুর জেলে। জেলে বিচারাধীন বন্দীদের মধ্যে কেউ ওর পরিচিত ছিল না। বন্দীদের নিজেদের তিনটি দল ছিল। প্রায় সবাই ওকে সন্দেহ করতো কেউ বিশ্বাস করতে না, কেউ কথাও বলতো না। যারা কথা বলতো, মিশতে আসতো, ও

বাকি ছেলে দুটি ছোট, আট পাঁচের মধ্যে। বউদি অনায়াসেই একদিন শংকরকে বলেছিলেন, 'অপারেশন করে মা ষষ্ঠীকে বিদায় দিয়েছি ভাই। মানুষ করবো কী করে?' বলেই লজ্জা পেয়ে হেসে তাড়াতাড়ি কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন।

শংকরের নিজের দাদা বউদির কথা মনে পড়েছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের কাছে আটকে ছিল। না, দোষ কারোকেই দেওয়া যায় না। মানুষ তো কেউ ছকে বাঁধা না। ও মহিমবাবুর সংসারের একজন হয়ে উঠেছিল। অবিশ্যি নিজের দাদা বউদির কাছে ও যেতো। বউদির তখন একটি মেয়ে হয়েছিল। বিজিতের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। বিজিত তর্ক করতে চেয়েছিল। শংকর তর্ক করে নি, হেসে বলেছিল, 'বিজু, পার্টি হয় তো আমার কোনো কালেই করা হবে না। প্রিয় ভয়ে পালিয়েছে। আমার পালাবারও দরকার নেই। তবে আমার বিশ্বাসকে কেউ টলাতে পারবে না। সংবিধান নির্বাচন, এ সবই এ দেশে মিথ্যা, চরিত্রহীনদের দল বাড়ায়। বিদ্যাসাগর বলতেন, এ দেশের সাত প্রস্থ মাটি উৎখাত করে ফেলে দিলে, প্রকৃত রূপটা দেখা যাবে। কথাটা সত্যি। সাত প্রস্থ মাটি উপড়ে ফেলা মানে, সশস্ত্র বিপ্লব। কবে হবে জানি না, কিন্তু হবে। কোটি কোটি মানুষ বহু বছরের সব অন্যায়কে উপড়ে ফেলে দেবে। নেতৃত্ব দেবে ওরাই, আমরা না। মাঝখানে আর যা সব ঘটবে, তা হলো পাপের ভরাডুবিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আনা। দেখতেই পাচ্ছি।'

বিজিত বিদ্রূপ করে হেসে বলেছিল, 'সত্য যুগ আসবে, না? জ্যোতিষী করছিস নাকি আজকাল?'

শংকর হেসে বলেছিল, 'বিশ্বাসের কথা বললাম। তুই যা খুশি বলতে পারিস।' 'কিছুই বলবো না, তুই অবসেশনে ভুগছিস, এটাই দেখছি।'

'তা হলে এই অবসেশন নিয়েই মরবো।'

ছ' মাসের মধ্যে পুলিশের কাছ থেকে কোনো অভিযোগ আসে নি। অতএব শংকরের স্থায়ী চাকরিতে কোনো ছেদ পড়ে নি। জেলে থাকাকালীন বেতন পায় নি, বিনা বেতনে ছুটি রেকর্ড করা হয়েছিল।

শংকর সেই সময়েই বি. টি. পাশ করেছিল। মহিমদা আর বউদি এতো খুশি হয়েছিল, যেন কৃতিত্বটা তাঁদেরই, একদিক থেকে তাই। বউদি প্রীতিলতার সহায়তা না পেলে, পড়ে পাশ করা সম্ভব ছিল না। ইস্কুলেও শংকরের খাতির বেড়েছিল। ইস্কুল কমিটি বদলে ছিল, এবং কমিটি শংকরের ওপর প্রসন্ন ছিল। ইস্কুল কমিটি মানেই, বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব। দলীয় ক্ষমতার সঙ্গে সব কিছুই বদলায়। কমিটির প্রসন্নতার হাত এতোদূর অগ্রসর হয়েছিল, কয়েকজনকে ডিঙিয়ে শংকরকে হেডমাস্টার করার প্রস্তাব উঠেছিল। প্রতিদানে শংকরকেও কমিটি তাদের নিজেদের দলে টানতে চেয়েছিল।

সময়টা ভালো ছিল না। পঁচাত্তরের এমারজেন্সির সময়। ইস্কুলে রাজনীতির চক্র গড়ে উঠেছিল। ক্ষমতাশালী দল কোনো নীতি নিয়ম মানতে রাজি ছিল না। যোগ্য শিক্ষকদের অসম্মান করা হচ্ছিল। অযোগ্যদের আস্ফালন বেড়ে উঠেছিল। নোংরা রেষারেষি আর প্রতিযোগিতায় ইস্কুলের আবহাওয়া বিষিয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক দলের বেপরোয়া বহিরাগতরা ইস্কুলের ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছিল। যারা ভালো করে বাংলা বলতে শেখে নি, ইস্কুলে ঢুকে তারা মাতব্বরি করছিল। শংকরের অবস্থা হয়েছিল সব থেকে অস্বস্তিকর, কারণ সেই সব মাতব্বরেরা ওকে তাদের নিজেদের লোক বলে চালাতে চাইছিল।

শংকর প্রধান শিক্ষক হতে অস্বীকার করেছিল। শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে কমিটি মেম্বার হতেও আপত্তি জানিয়েছিল। ওকে নিয়ে ভ্রূকুটি সন্দেহ আর বিস্ময়ে দেখা দিয়েছিল। সুযোগ সুবিধা চায় না, নিজের অবস্থা গুছিয়ে নিতে চায় না, ক্ষমতা প্রতিপত্তি চায় না। এমন লোক তো সুবিধার নয়। এ লোক তো বিপজ্জনক! মহিমদা বউদিও শংকরকে সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁরা ওকে বোঝাতেও চেয়েছিলেন। শুধু তো শংকরের ভালো না, তাঁদেরও যে মঙ্গল হবে, উপকার হবে।

শংকর বিষণ্ণ হেসেছিল। মহিমদা বউদির মঙ্গল করার জন্য, অমঙ্গলের সঙ্গে হাত মেলানো ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ সে-কথা তাঁদের মুখ ফুটে বলার মতো স্পষ্টবাদীতা ওর ছিল না। জীবনকে দেখার একটা নীতি ও নিয়ম ও মেনে নিয়েছিল। ও শান্তিপ্রিয় বটে, তা আপোষের দ্বারা সম্ভব ছিল না। সোচ্চার প্রতিবাদে ইস্কুলের পরিস্থিতিকে বদলাতে না পারার জন্য ওকে পলাতক বলা যেতে পারে। কিন্তু ও জানতো পরিস্থিতি বদলানো যাবে না, অশুভ পরিবেশকে ডেকে আনা হবে। প্রতিবাদের এক মাত্র পথ ছিল, সেই ইস্কুল থেকে চলে যাওয়া।

শংকর তাই করেছিল। খবরের কাগজে, শালচিতি নামে এক প্রাচীন গ্রামের উচ্চমাধ্যমিক ইস্কুলের বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিল। ডাক পেতে দেরি হয়নি। ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে চাকরিও পেয়েছিল। আগের ইস্কুলে ইস্তাফা দিয়ে ও চলে এসেছিল এই শালচিতি গ্রামে। সেক্রেটারি দেবতোষ চট্টোপাধ্যায় ধনী ব্যক্তি, বয়স প্রায় শংকরের মতোই। সামান্য দু-চার বছরের বড় হতে পারে। শংকরকে তার খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। সে-ই গ্রামে মধ্যে এক মুখুজ্জে ব্রাহ্মণের বাড়ির একটি দোতলা খড়ের চাল মাটির ঘর ভাড়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। নিজের দাদার ছেলেমেয়েদের পড়ানো এবং রাত্রে খাওয়া, অন্য এক কায়স্থ বাড়িতে সকালে ছেলেমেয়ের পড়ানোর পরিবর্তে দুপুরে খাওয়া, সবই তার ব্যবস্থানুযায়ী হয়েছিল।

শংকর বুঝেছিল, দেবতোষ কেবল প্রাচীন জমিদার বাড়ির সন্তান না, শাসকদলের একজন হোমরা-চোমরা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। গ্রামে তার চ্যালাচামুণ্ডাদেরই প্রতিপত্তি। সান্ত্বনা ছিল এই, ইস্কুলের আবহাওয়া খারাপ ছিল না। শংকর যাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল, তিনিও স্থানীয় লোক ছিলেন না। নিতান্ত বার্ধক্য বশত চাকরি ছেড়ে গিয়েছিলেন। ইস্কুলের সব শিক্ষকরা শংকরকে খুশি মনে নিয়েছিল, এমন না। তবে অনেকেই নিয়েছিল। তার মধ্যে রাখালবাবু একজন, যিনি এখন এম. এল. এ.। তিনি একজন বিশেষ দলের নেতা বটে, কিন্তু এমন সাদাসিধে সর্বজনমান্য লোক, একটা বিরল ঘটনা। দেবতোষের মতো

বিরুদ্ধ দলের লোকও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে। ক্ষমতায় যখন ছিল তখনও করত, এখনও করে।

যাই হোক, ছিয়াত্তরের পর এই উনআশির প্রথম মাসে, অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। সেই পরিবর্তনের ঝাপটা শংকরের গায়েও লেগেছে। অনেক সময় মনে হয়েছে, হয়তো ওকে শালচিতি ছেড়ে চলে যেতে হবে। হয় নি। এখনও টিঁকে আছে। পরিস্থিতি সব দিক থেকে অনুকূল না হলেও, হয়তো থাকতে পারবে, শংকরের আশা।

৮

গ্রামের ভিতরে ঢোকার প্রধান দুটি সড়ক, বেশ চওড়া। ঘনবসতি গ্রামের ভিতর দিয়ে সড়ক দুটি এক জায়গায় গিয়ে মিলেছে, উত্তরের প্রান্তে। উত্তরের প্রান্তে একটি আঁকাবাঁকা ছোট নদী, নাম চিতি। চিতির ধারে ধারে এক সময়ে বড় বড় গাছের ঘন বন ছিল। আস্তে আস্তে অনেক ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। বন বিভাগ গাছ চোরদের কোনো কালেই কোথাও সামলাতে পারে না। চিতির ধারেই ফারাকে ফারাকে তিনটি শ্মশান। সড়ক দুটি মিলেছে চিতির ধারে, গ্রামের পূর্ব সীমান্তে। গরুর গাড়ি, জীপ অনায়াসেই সড়কের ওপর দিয়ে চলে। অঘ্রাণ পৌষ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র, বর্ষার আগে পর্যন্ত, এমন কি লরিও চলে, এবং নদী পেরিয়ে কাঁচা চওড়া সড়কের ওপর দিয়ে পুবে চলে যায় হুগলি জেলার ভিতরে।

জাতীয় সড়ক থেকে একটি বড় রাস্তা গ্রামে ঢুকেছে, চণ্ডীতলার মোড় দিয়ে, যে চণ্ডীতলার মোড়ে দুলালের চায়ের দোকানে শংকর বিকালে চা খাচ্ছিল। আর একটা বড় রাস্তা ঢুকেছে, চণ্ডীতলা থেকে পশ্চিমে এগিয়ে। শংকরের পক্ষে গ্রামে ঢোকার সেটাই আপাতত কাছের রাস্তা। গন্তব্য পশ্চিমপাড়ায় যাবারও এটা সংক্ষিপ্ত রাস্তা। এই মোড়েও চায়ের দোকান, মুদিখানা ও একটি ছোট মিষ্টি আর তেলে-ভাজার দোকান আছে। প্রত্যেক দোকানেই হ্যারিকেন জ্বলছে। চাদর মুড়ি দেওয়া ছায়া মূর্তিরা সব গায়ে গায়ে বসে দোকানগুলোতে কথা-

বার্তা বলছে। গ্যাজ্জাচ্ছে বললেই ঠিক হয়। শালচিতিতে আজ সন্ধ্যারাত্রে সকলের আলোচ্য বিষয় একটাই। বুধাইয়ের মৃত্যুর থেকেও, বদির বউয়ের টাকা পাওয়া। এ-সব খবর হাওয়ার আগে ওড়ে।

শংকর অন্ধকারে অনায়াসেই পশ্চিমপাড়ায় চাটুযোবাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। পুরনো প্রাচীন দোতলা বাড়িটার চৌহদ্দি অনেকখানি। অন্ধকারে থামওয়ালা বাড়িটার দরজা জানালা সবই প্রায় বন্ধ, একটা অস্পষ্ট অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দক্ষিণে দুটি মন্দিরের চূড়া, নিবিড় ঘন গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে, এবং তারা ভরা আকাশের গায়ে তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চাটুয্যেদের সাতপুরুষ আগে প্রতিষ্ঠিত সর্বাণীদেবী ও মহাকালির মন্দির। গ্রাম্য দেবী ও সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির আরও পূবের ভিতরে।

চাটুয্যেদের প্রাচীন থামওয়ালা চক মেলানো বাড়ির পাশেই হাল আমলের নতুন দোতলা বাড়ি। তার অধিকাংশ দরজা জানালা বন্ধ থাকলেও, নিচের বাইরের ঘরের কাঁচের জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ থাকলে লোহার গ্রিলের গেটের মাথায় আলো থাকত। বাগান, গ্যারেজ, সামনের ছাদ আঁটা বারান্দা সবই দেখা যেত। এখনও যে একেবারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, এমন না। শংকরের অন্ধকার সয়ে যাওয়া চোখে সবই অস্পষ্ট ভাসছে। পুরনো জমিদার বাড়ি বলতে যেটিকে বোঝায়, সেখানে এখন দেবতোষ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেঠামশাই সপরিবারে থাকেন। পিতৃহীন দেবতোষ আর তার দাদা মনতোষ সাবেক বাড়ির প্রায় গায়েই নতুন বাড়ি করেছে।

জমিদারি অনেক কাল গত। কিন্তু জ্যাঠামশাই হরতোষ চাটুয্যে পুরনো বাড়িতে এখনো সাবেক চাল চলন বজায় রাখার চেষ্টা করেন। যদিও তা সম্ভব না। দেবতোষের নতুন বাড়ির মতো, গাড়ি, টি-ভি,টেলিফোন না ঢুকলেও, ছেলে মেয়ে বউ নাতি নাতনিদের চাল-চলন বদলে গিয়েছে। চাটুযোরা এখন বলতে গেলে বড় জোতদার। একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরেছে অনেক কাল আগেই। এখন জমি বাঁচাতে সকলেই ভিন্ন। এমন কি দেবতোষ মনতোষ দুই ভাইও ভিন্ন, অন্যথায় মাথা পিছু যে জমি প্রাপ্য তা রাখা যায় না। অবিশ্যি এ দু'

ভাইয়ের আলাদা সংসারের নল্‌চে আড়ালে যে একান্নবর্তী পরিবার বিরাজ করছে, তা বাইরে থেকে প্রমাণ করা কঠিন। তা ছাড়া আছে সর্বাণী ও মহাকালির দেবোত্তর ভূমি ও সম্পত্তি। মন্দিরের বিগ্রহেরা সোনারূপোর অলংকারে সাজতে পারে। সম্পত্তি ভোগ করতে পারে না। এ সত্যটা সবাই জানে। কিন্তু ধর্মের দাবীটা মেনে নিতে হয়েছে সব দলের শাসকদেরই। তবে সাম্প্রতিক ভূমি রাজস্বের নিয়মানুযায়ী, চাটুয্যেরা প্রাইভেট দেবোত্তরের একত্রিশ বিঘার বেশির রাখে নি। রাখতো গেলে এস্টেটের বিষয় এসে পড়ে, সিকিউরিটি জমা দিতে হয়, একজন ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে এস্টেট চালাতে হয়, তাকে বেতনও দিতে হয়। অথচ ভূমির পরিমাণ, একত্রিশ বিঘার বদলে মাত্র একান্ন বিঘা বরাদ্দ। বাড়তি কুড়ি বিঘার জন্য চাটুয্যেরা এস্টেট, সিকিউরিটি, একজন আইনজীবি ম্যানেজার, ইত্যাদির ঝামেলা পোয়াতে চায় নি। তার পরিবর্তে বেনামী জমি নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি আর গোষ্ঠীর সঙ্গে চোরাই কারবারের লুকোচুরি খেলা, বিবাদ বচসা সংঘর্ষেই সবাই যেন বেশ স্বাভাবিক। সোনা রূপো টাকা লুকিয়ে রাখা যায়, বেনামীতে জমি কেমন করে লুকিয়ে রাখা যায়, শংকর কোনো দিন ভেবে কুলকিনারা পায় নি। দেবতোষ হেসে বলেছে, 'সর্ষের মধ্যে যদি ভূত থাকতে পারে, বেনামীতে জমি থাকতে পারবে না কেন? ও সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মাথা খারাপ করবেন না।'

শংকর মাথা ঘামায় নি, কেন না ওটা ওর কাছে অনাবশ্যক। ও গ্রিলের গেটের ছিটকিনি খুলতেই, মনে হল নিচের বাইরের ঘরের বন্ধ কাঁচের জানালায় কারোর ছায়া দেখা গেল। ও গেটের ভিতরে ঢুকে, ছিটকিনি বন্ধ করতেই বাইরের ঘরের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখলো, ঘরের আলো বাইরে এসে পড়েছে। দু'ধারে বাগানের মাঝখানে কাঁকর বিছানো চওড়া রাস্তা দিয়ে কয়েক পা এগোতেই, দুটি মূর্তি ছুটে এলো। মনতোষের বছর দশেকের ছেলে আর আট বছরের মেয়ে। চাঁদু আর বেবি। চাঁদুরই উদ্বিগ্ন গলা প্রথম শোনা গেল, 'মাস্টারকাকা, আপনাকে নাকি গাড়ি চাপা দিয়েছে?'

বেবি ইতিমধ্যে শংকরের কাছে এসে ওর হাত চেপে ধরেছে, 'হ্যাঁ, মাষ্টারকাকার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা!'

শংকর তুজনেরই হাত ধরে বাইরের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, 'আমাকে গাড়ি চাপা দেয় নি, এমনি একটু লেগেছে। গাড়ি চাপা পড়েছে বাউরিপাড়ার বদি বাউরির ছেলে বুধাই।'

'সে খবর আমরা আগেই পেয়েছি।' বাইরের ঘর থেকে, ডানদিকে ভিতরে ঘরে যাবার দরজায় দাঁড়িয়ে মল্লিকা, দেবতোষের স্ত্রী, তার চোখে মুখে উদ্বেগ, গলার স্বরে উদ্বেগ। কিন্তু আপনার লাগাটা তো সামান্য মনে হচ্ছে না। ভেতরে আসুন।'

শংকর চোখ তুলে তাকালো। মল্লিকা দরজার পাশে সরে দাঁড়ালো। লাল পাড়ের চওড়া তাঁতের শাড়ি, মাথার মাঝখান পর্যন্ত ঘোমটা টানা, আটপৌরে ধরনে পরা। গায়ের জামাটা সবুজ গরম কাপড়ের। পড়ার ঘরটা পাশের ডানদিকেই। বাইরের ঘরে হ্যাজাকের আলো জলছে, মাঝখানে রাখা একটা উঁচু টেবিলের ওপরে। পাশের ঘরের হ্যারিকেনের আলো সেই তুলনায় স্তিমিত। শংকর চাঁছু আর বেবিকে নিয়ে পাশের ঘরে গেল। মল্লিকা সরে গেল ঘরের এক প্রান্তে। শংকর বাগানের বন্ধ জানালা ঘেঁষে পড়ার টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো, 'তা একটু লেগেছে। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু আমাকে দেখেছেন। আসলে ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্যই আমার একটু লেগেছে। কিন্তু ছেলেটাকে বাঁচানো গেল না।'

'সে খবর গোটা গাঁয়ের লোক জেনে গেছে।' মল্লিকা বললো, 'আপনার সঙ্গে সেজদার দেখা হয়নি?' সেজদা হলেন দেবতোষের দাদা মনতোষ। পুরনো বাড়ির জ্যাঠামশাইয়ের বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্রদের হিসাবে, মনতোষ চাটুয্যে বাড়ির সেজদা। সাবেকি ভাসুরঠাকুর সম্বোধন, ঘোমটার আড়াল, ইত্যাদি বর্তমান চাটুয্যেবাড়িতে অচল। শংকর অবাক হয়ে বলল, 'মনতোষবাবু আবার আমার খোঁজে গেছেন নাকি? কোথায় গেলেন?'

চাঁছু বলল, 'থানায়।'

শংকর বিব্রত অস্বস্তিতে বললো, 'কী দরকার ছিল? জানিনে

কোন্ পথে গেছেন, দেখা হলে ভালোই হতো। কারোকে পাঠিয়ে এখনই ওঁকে ডেকে আনা উচিত। অকারণ আমার জন্য ওঁর থানায় ছোটার কোনো দরকার ছিল না।'

'সেজবাবুর জন্য আপনি এত ভাবছেন কেন?' ভিতরের দালানে যাবার দরজায় এসে দাঁড়ালো মনতোষের স্ত্রী আরতি, 'উনি আপনাকে থানায় না দেখতে পেলে বাড়ি চলে আসবেন। আপনি বসুন। বরং চাঁদু বেবি এখন ভেতরে যাক।'

শংকরের ব্যাণ্ডেজের বাইরে দু'চোখে অবাক জিজ্ঞাসা, বললো, 'ওরা ভেতরে যাবে কেন? পড়তে বসবে না?'

শংকরের থেকে অধিকতর বিস্ময় মল্লিকা আর আরতির চোখে। দুজনে পরস্পরের দিকে দেখলো। বিস্ময় চাঁদু আর বেবির চোখেও। চাঁদু বলে উঠলো, 'মাস্টারকাকা আজও পড়াবেন?'

'কেন, আজ কী হয়েছে?' শংকর হেসে বললো, 'কাল কি তোমাদের ইস্কুলে পড়া নেই?'

মল্লিকা গম্ভীর স্বরে বললো, 'ইস্কুলের পড়া ওরা আজ নিজেরাই পড়ে নেবে, আপনাকে পড়াতে হবে না। আপনি বসুন।'

'এমন তো নয় যে রাত পোহালেই পরীক্ষা?' আরতি বললো, 'এই শরীর নিয়ে পড়াতেই হবে, এমন কোন কথা নেই।'

শংকর খানিকটা অসহায় অস্বস্তিতে হেসে মল্লিকা আর আরতির দিকে দেখলো। এগিয়ে গিয়ে বসলো, চেয়ারে। চাঁদু আর বেবিকে বললো, 'তা হলে আজ মা কাকিমার কথাই থাক। পড়ার বইপত্র নিয়ে তোমরা ভেতরে যাও।'

বেবি তখনও শংকরের হাত ধরে ছিল। চাঁদুরও এখনই এ ঘর ছেড়ে যাবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মা কাকিমা এবং স্বয়ং মাস্টারকাকার কথায় ওদের বই খাতা নিয়ে চলে যেতেই হল। শংকরের কাছে এই মুহূর্তের পরিবেশ অস্বস্তিকর। ও বুঝতে পারছে, চাঁদু বেবিকে সরিয়ে দেওয়াটা দুই জা-য়ের ইচ্ছাকৃত ব্যাপার।

মল্লিকার মতো আরতিরও নীল পাড় তাঁতের শাড়ি পরা। শাড়ির ওপরে জড়ানো একটি লাল রঙের মোটা সুতোর চাদর, যার এক অংশ

মাথায় ঘোমটার মতো তোলা। নিতান্তই ঘরে ব্যবহারেরর জন্য, এবং বুকের দু'পাশে ছড়ানো। মল্লিকার বয়স যদি তিরিশ হয়, আরতির পঁয়ত্রিশ। মল্লিকা উজ্জ্বল শ্যাম, টানা চোখ, টিকলো নাক, মেদহীন দীর্ঘ শরীরে ঔদ্ধত্য নেই। নম্র লাবণ্যের একটি স্নিগ্ধ ঢল যেন সর্বাঙ্গে উপছানো। সে নিঃসন্তান। সেই তুলনায় তিন সন্তানের জননী, আরতি দীর্ঘাঙ্গীনা, অথচ ছিপছিপে। রঙ ফরসা, স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে এমন একটা অনমনীয়তা, বয়স তাকে কোথাও যেন স্পর্শ করতে পারে নি। স্নিগ্ধতার থেকে রূপের ঝলকটাই বেশি। তার আয়ত কালো চোখ, ঠোঁট, নাক, সবই যেন তীক্ষ্ণ, কাটা কাটা। মল্লিকাকে দেখলে মনে হয়, কোথায় একটা বিষাদের ছায়া ওকে ঘিরে আছে। আরতির আরক্ত ঠোঁটে, কালো চোখের তারায় স্ফুরিত হাসি যেন রুদ্ধ হয়ে আছে। অবকাশ পেলেই ঝিলিক হানবে। রূপের আঁচ ঝাঁঝ ঝলক, সব কিছুতেই যৌবনের ঝংকার। কিন্তু রূপ নিয়ে তার অহংকার বা বাচালতা নেই। সে বুদ্ধিমতী, গ্রামীণ সহজ সাবলীলতা তার কথায় ও আচরণে। সেই হিসাবে, মল্লিকার কথাবার্তা আচরণে কিছুটা গাম্ভীর্য, শহুরে শিক্ষার ছাপ স্পষ্ট।

'শংকরদা, যে লোকটি গাড়ি চাপা দিয়েছে, সে নাকি আপনার কলকাতার বন্ধুর ভাই?' মল্লিকা জিজ্ঞেস করলো।

শংকর মুখ ফিরিয়ে মল্লিকার দিকে তাকালো, তারপরে আরতির দিকে। বললো, 'হ্যাঁ, এক রকম তাই বলা যায়।'

'আমি কি আপনার সে বন্ধুকে চিনি?' মল্লিকা জিজ্ঞেস করলো।

শংকর বললো, 'জানি নে। তুমি কি কখনো প্রিয়ব্রতকে আমাদের আলিপুরের বাড়িতে দেখেছো?'

মল্লিকার ভাসা চোখে অন্যমনস্কতা। একবার আরতির দিকে তাকালো, তারপরে মাথা নেড়ে বললো, 'মনে করতে পারছি নে।'

শংকর বললো, 'তুমি বোধ হয় প্রিয়ব্রতকে চেনো না।'

'আপনি বন্ধুর ভাইকে বাঁচাবার জন্য, টাকা দিয়ে সব মিটমাট করিয়েছেন?' মল্লিকার মুখ গম্ভীর।

শংকর অবাক চোখে তাকালো, তারপরে হেসে বললো, 'টাকা নিয়ে মিটমাটের কথা আমি কিছুই জানি নে। গ্রামের মাতব্বররাই থানায় বসে সে ব্যবস্থা করেছে।' ও আরতির দিকে তাকিয়ে বললো, 'বউদি, আপনি আমাকে একটু চা দিন।'

আরতি তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে পা বাড়িয়ে বললো, 'এখুনি নিয়ে আসছি।'

শংকর একবার মল্লিকার দিকে দেখলো। মল্লিকা ওর দিকেই তাকিয়েছিল বললো, 'হরি তা হলে মিথ্যা সংবাদ নিয়ে এসেছে।'

হরি এ বাড়ির ভৃত্যদের প্রধান। শংকর বললো, 'হরিকে কেউ মিথ্যে বলেছে।'

এই সময়ে বাইরের ঘরের দরজায় কড়া বেজে উঠলো। মল্লিকা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। এই মল্লিকা শংকরের ছোট বোন প্রতিমার বন্ধু ছিল, একসঙ্গে পড়তো, এক সময়ে আলি-পুরের বাড়ি যাতায়াত করতো। শংকরের সঙ্গে পরিচয় ছিল সামান্য। বৈশিষ্ট্য কিছু ছিল না, ছোট বোনের আর দশটা বন্ধুর মতোই, মল্লিকার দিকে বিশেষ চোখে কখনো তাকাবার দরকার হয় নি। দেবতোষের সঙ্গে এ বাড়িতে এসে, প্রথম জানতে পেয়েছিল, সেই সামান্য পরিচিতা, ছোট বোনের বন্ধু মল্লিকা চাটুয্যে বাড়ির ন' বউ। শংকরকে শংকরদা বলে ডাকবার নির্দেশ বা অনুমতি মল্লিকাকে দিয়েছে তার স্বামী স্বয়ং দেবতোষ।

মনতোষ হন্তদন্ত হয়ে বাইরের ঘর থেকে কথা বলতে বলতেই ভিতরের ঘরে এসে ঢুকলেন। ওঁর বাইরের চেহারাটি খুবই সাধাসিধে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হিসাবে, অনেকটাই প্রৌঢ় মনে হয়। ছোট করে ছাঁটা মাথার চুলে বেশ পাক ধরেছে। গোঁফ জোড়াতেও। দীর্ঘ মেদহীন শরীর, খড়্গ নাসা বলতে যা বোঝায়, তাই। মোটা ভুরুর নিচে, চোখের কোলে ও কোণে ভাঁজ না পড়লে দেখা যেতো, ওঁর চোখ দুটি বড়ই। রঙও ফরসাই বলা যায়, গ্রামের রৌদ্র জলে কিছুটা তামাটে। ধুতি পাঞ্জাবী গায়ের পশমী আলোয়ান আর পায়ের

পাম শু জাতীয় পাদুকায় সম্পন্নতার ছাপ স্পষ্ট, কিন্তু পোশাকে ঔজ্জ্বল্যের অভাব, এবং একটা গ্রামীণ ছাপ স্পষ্ট। এমনিতে ওঁর চোখের দিকে তাকালে মনে হয়, একজন গ্রাম্য চাষীর সরলতা, আসলে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ. সর্বদাই অনুসন্ধিৎসু, সময়ে অতি শাণিত। আসলে মানুষটি ধূর্ত ও চালাক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, এ সবই তাঁর বাইরের জীবন যাপনের, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিষয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের, গ্রামীণ জীবনের বৈশিষ্ট্য। সংসারে, পিতা, স্বামী, ভাসুর, দাদা হিসাবে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত সহৃদয়, স্নেহপ্রবণ, কর্তব্যপরায়ণ।

মনতোষের ব্যস্ত গলা বাইরের ঘর থেকেই এগিয়ে এলো, 'বলে আইবে ? কী করে্য এলো ?' বলতে বলতে পাশের ঘরে ঢুকে বললেন, 'কুন্ রাস্তা দিয়ে এল্যে মাস্টার ? থানার রাস্তা ত একটাই।'

মনতোষ আঞ্চলিক গ্রামীণ ভাষা থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করলেও, পুরোপুরি পেরে ওঠেন না। শংকর পশ্চিমের যে-মোড় দিয়ে ঢুকেছে, সেই মোড়ের নাম সর্বাণীতলার মোড়। গ্রামের লোকেরা বলে, দেবীর মোড়। শংকর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি দেবীর মোড় দিয়ে এসেছি। আপনি কোথা দিয়ে গেলেন, আর গেলেনই বা কেন ?'

মনতোষ ভ্রূকুটি অবাক চোখে, পিছন ফিরে মল্লিকার দিকে তাকালেন, 'শুনেছ ন'বউমা, তোমার শংকরদার কথা শুনছ কি বটে, অ্যাঁ ? গটা শালচিতি তোলাপাড়া হয়ে গেল, শংকর মাস্টার আর বদি বাউরির ব্যাটা গাড়ি চাপা পড়ে হাসপাতালে, তারপরে মাথায় মুখে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে মাস্টার থানায়। ই খবর শুন্যে আমি ঘরকে বস্যে থাকতে পারি ?' তিনি আবার তাকালেন শংকরের দিকে।

মল্লিকা শংকরের দিকে তাকিয়ে হেসে মুখে আঁচল চাপা দিল। শংকর বললো, 'আপনি বসুন মনতোষবাবু ?'

'তুমি বস।' বলে মনতোষই শংকরের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসলেন, 'বিত্তান্ত যা শোনবার, আমি সবই শুন্যে আইচি। ও, আমি দেবীর মোড় দিয়ে যাই নাই, গেছি চণ্ডীতলার মোড় দিয়ে। দুলালের মুখে শুনলাম, গাড়ি চালাচ্ছিল যে ছোঁড়া, উয়ার সঙ্গে তোমার মারপিট হইচে। উতেই তুমি জখম হয়েছে। তার আগেই বদির ব্যাটাটা

গাড়ির তলায় চিড়ে চ্যাপটা ?'

শংকর স্বভাবসিদ্ধ হেসে বললো, 'তা একরকম ঠিকই শুনেছেন। আর ঐ দুলালের সঙ্গে কথা বলতেই আপনার সময় লেগেছিল, সেই-জন্যই পথে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।'

'তা কী করব ?' মনতোষ দু' হাত তুলে বললেন, 'দুলাল ব্যাটা যে-ভাবে সেজবাবু সেজবাবু বলে চেঁচাতে লাগলে, উয়ার কথা না শুন্যে যেতে পারছিলাম নাই।'

মল্লিকা বললো, 'তার আগে হরি সব খবরই নিয়ে এসেছে। যে-লোক গাড়ি চাপা দিয়েছে, সে নাকি শংকরদার বন্ধুর ভাই।'

'অই, সে-কথা তুমি আমাকে কী বলবে গ ন' বউমা ?' মনতোষ একবার ভিতর দরজার কাছে মল্লিকাকে দেখে নিলেন। 'তোমার শংকরদার বন্ধুর ভাই, ভাইয়ের বউ, সব্বাইকে দেখ্যে এলাম। আর ঐ উয়াদের—পার্টির বাস্তুঘুঘুগুলানকেও দেখ্যে এলাম। থানার বড়-বাবুর সঙ্গে সব্বাই আসর কর‍্যে বসেছে। উদিকে বদির মড়া ব্যাটাটাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার তোড়জোড় চলছে। তবে একটা কাজ তুমি ভাল কর নাই শংকর।'

মনতোষ শংকরকে কখনো মাস্টার বলে ডাকেন, কখনো শংকর। শংকর এবার চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি আবার কী মন্দ কাজ করলাম ?'

মনতোষ কিছু বলবার আগেই আরতি ধোঁয়া ওঠা গরম চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকলো। এগিয়ে এসে শংকরের সামনে টেবিলের ওপরে রাখলো। মনতোষ আরতি, চায়ের কাপ, তারপর শংকরের দিকে তাকিয়ে, আবার আরতির দিকে ফিরে বললেন, 'গরম চা তো দিলে, কিন্তু লোকটার গায়ে একটা জামা ছাড়া আর ত কিছু নাই। আমার বা দেবুর একটা শাল চাদর যা-হক এন্যে দাও ক্যানে সেজ বউ।'

শংকর বললো, 'না না, আমার তেমন শীত করছে না।'

'আমি নিয়ে আসছি।' মল্লিকা দ্রুত পায়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

ইতিমধ্যে বাবার গলার শব্দ পেয়ে, চাঁদু আর বেবিও এসে দরজায় উঁকি দিচ্ছিল।

শংকর জিজ্ঞেস করলো, 'আমি কি মন্দ কাজ করেছি, বললে না?'

'অই, হুঁ, আমি শুনলাম, তোমার বন্ধুর ভাই বলে, তুমি নাকি টাকা পয়সা দিয়ে সব মিটমাট করাই দিয়েছ?' মনতোষ সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন, 'বড়বাবুকে ঘুষঘাষ খাইয়ে, বেশ মোটা টাকার লেনদেন করে বদির বিধবাকে দু'হাজার টাকা দিয়ে, কী সব মুচলেকার টিপ মারা করাইছ?'

শংকর হেসে চায়ের কাপ তুলে চুমুক দিল, 'হরি এসে বাড়িতে আগেই এ রকম কথা বলেছে, আমি সেজ বউদি আর মল্লিকার মুখে শুনেছি।'

'তা হলেই বুঝ ক্যানে, গটা গাঁয়ে কথাটি কেমন রাষ্ট্র হয়েছে?' মনতোষের চোখে মুখে অসন্তোষের ছায়া, 'তুমি ক্যানে ই সবের মধ্যে জড়াতে গেলে?'

শংকর হেসে বললো, 'এইটুকু সময়ের মধ্যে কথাটা কে বা কারা রটালো, আমি অবিশ্যি জানি না। তবে আপনাকে এটুকু বলতে পারি, আমার বন্ধুর ভাইয়ের সঙ্গে থানায় বসে টাকা পয়সা দিয়ে যখন সব মিটমাটের ব্যবস্থা হচ্ছিল, আমি তখন হাসপাতালে ছিলাম।'

'অ্যাঁ, অই, কী বলছে হে মাস্টার?' মনতোষের চোখের চারপাশ কুঁচকে উঠলো, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো।

শংকর বললো, 'হ্যাঁ। হাসপাতালের ডাক্তার তখন আমার কপালে সেলাই করে ওষুধ ইনজেকশন দিচ্ছিল। দুজনে একসঙ্গে থানায় গিয়ে শুনলাম, বদির বউকে দু' হাজার টাকা দেবার কথা হয়েছে। ঘুষঘাষের কথা অবিশ্যি কিছু শুনিনি। সে-ব্যবস্থার কথা শুনে ডাক্তার তো ক্ষেপেই লাল। থানার ও. সি-র সঙ্গে কিছু কথা কাটাকাটিও হলো। নিজের রিপোর্ট দিয়ে, সদরেও রিপোর্ট পাঠাবে বলে, গটগট করে বেরিয়ে চলে গেল।'

'হুঁ, হুঁ, ইবারে বুঝেছি।' মনতোষ শক্ত মুখে মাথা ঝাঁকালেন, 'অর্থাৎ কি না, তুমি আর ডাক্তার আসার আগেই ঐ বাস্তু ঘুঘুগুলান—অই যাদের দেখলাম, থানায় বস্যে রইচে, গুইরাম,

কার্তিক, শরৎ বেরা, তার উপরে আর শিবে চক্কোত্তিও, পার্টির নিডারবাবু—।'

মনতোষের কথা শেষ হবার আগেই শংকর হেসে উঠলো। মনতোষ শক্ত মুখে ভুরু কুঁচকে তাকালেন, 'হাসছ ক্যানে? ইয়াতে হাসির কথা কী আছে?'

'আপনার বাস্তুঘুঘু শুনে হাসি পেলো।' শংকর আরতির দিকে তাকালো।

আরতিও তার কালো চোখের তারায় ও নাকছাবির হীরেতে ঝিলিক দিয়ে হাসছিল। মনতোষ চড়া স্বরে ঝেঁজে উঠলেন, 'ক্যানে বলব নাই বল। উয়াদের কি আমি চিনি না? উপোষি ছারপোকার এখন নিজেদের সরকার করেছে, আর দু'হাতে লুট্যেপুট্যে খাইচে তোমাকে আমি বাজি রেখ্যে বলতে পারি, তোমার বন্ধুর ভাইয়ের কাছ থেক্যে, থানার বড়বাবুটি আর গুইরামের দলও টাকা খেয়েছে।'

'সে তো আপনার—।' শংকর কথা শেষ না করে চায়ের কাপে চুমুক দিল, আর ওর স্বভাবসিদ্ধ হাসি মুখে, কিঞ্চিত সংকোচের সঙ্গে বললো, 'যাদের দল যখন সরকার গড়ে, ক্ষমতায় থাকে, তারাই ও-সব করে থাকে। ওটা তো নতুন কিছু না। অবিশ্যি আমি জানিনে গুইরাম, শিবু চক্রবর্তীরাও টাকা খেয়েছে কী না। তবে দারোগার কথা বলতে পারিনে। সেটা আপনিও ভালো জানেন, যখন যারা সরকার চালায়, পুলিশ তখন তার মন যুগিয়ে চলে।'

শংকরের কথার মাঝখানেই, মনতোষ ঘাড় ঝাঁকিয়ে হাত তুলে কিছু বলতে চাইছিলেন। কিন্তু বলতে পারছিলেন না। তিনি বিরক্ত রুষ্ট মুখে একবার আরতির দিকে দেখলেন। শংকরের কথার মাঝখানেই মল্লিকা একটি পশমী শাল এনে ওর কাঁধের ওপর ছড়িয়ে দিল। মনতোষ বললেন, 'অই—অই মাষ্টার তোমার সেই এক কথা। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। কথাটা আমি মানি হে, ত তুমি আমাদের দেবুকে কখনো অমন কাজ করতে দেখেছ? বল, তুমিই বল, দেবুকে ত তুমি ভাল চিন, উ কখনো গাঁয়ের লোককে ঠকাইচে?'

শংকরের কথার মধ্যে কখনো কেউ জেদ বা ঝাঁজ দেখেনি।

রাজনৈতিক বিষয়ে বা গ্রামের কোনো ঘটনায়, ও কখনো বক্তৃতাও করেনি। ওর বিশ্বাসের কথা ও হেসেই বলে। দেবতোষ যখন এম. এল. এ. ছিল, ইস্কুলের সেক্রেটারি ছিল, সে-ই তখন শংকরকে চাকরি দিয়েছিল। একজন চালচুলোহীন যুবককে গ্রামে বাস করার মতো সব রকম সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছিল। তার পিছনে মল্লিকার হাতও ছিল অনেকখানি। শংকর চাকরি নিয়ে এখানে আসার পরেই, মল্লিকা ওকে চিনতে পেরেছিল। কিন্তু শংকর কখনোই দেবতোষের দলীয় রাজনীতিকে, আদর্শকে, কার্যকলাপকে সমর্থন করেনি। মুখোমুখি প্রতিবাদও করেনি। ভিতরে ভিতরে আপোষহীন মনোভাব পোষণ করেছে। কখনো-সখনো কোন কারণে দেবতোষের কাজে কর্মে ওর মতামত চাইলে, ও হেসে অনায়াসেই বলেছে, 'গরীব জনসাধারণের উপকার তো সবাই করতে চায়। স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে নানা দলের রেষারেষি কমপিটিশানও কম দেখলাম না। কিছু মনে করবেন না দেবতোষবাবু, প্রাণ যায় উলুখাগড়াদেরই। আপনাদের রাজনীতিতে আমি নেই। আমার ভুল হলে, ক্ষমা করবেন। আপনারা বা আপনাদের যারা বিরোধী, তাদের কারোর মধ্যেই আমি বিশেষ তফাৎ কিছু দেখতে পাইনে। শহরেই বলুন আর গ্রামেই বলুন, নেতা আর দলগুলোর চ্যালাচামুণ্ডাদের শ্রেণী আর চরিত্র একই রকম। সকলেই গণতন্ত্রের কথা বলে, সকলেই সমাজতন্ত্রের কথা বলে, কিন্তু গরীবরা আরও গরীব হচ্ছে, বড়লোকেরা আরও বড়লোক হচ্ছে। আমি দেখি, লক্ষ লক্ষ গরীব রাজনীতি বোঝে না, তারা বড় অসহায়। আপনি ধরে নিতে পারেন, আমিও সেই রকম একজন অসহায়।'

দেবতোষ হেসে বলেছে, 'আপনি এভাবে কথা বললে তো ভাই আপনার সঙ্গে কোন কথাই চলে না। সত্যি কি আপনার কোন রাজনৈতিক মতবাদ নেই? আমি অবিশ্যি আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি, এককালে আপনাদের অবস্থা খুব ভালো ছিল, আপনি ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র ছিলেন, কিন্তু ও নাকি আপনাকে কখনো রাজনীতি করতে দেখে নি। তবু একটা মতবাদের প্রতি সমর্থন সকলেরই থাকে। আপনার কি সে-রকমও কিছু নেই? কেননা, রাজনীতিকে বাদ দিয়ে এ যুগে কেউ চলতে পারে বলে আমার মনে হয় না।'

শংকর হেসে বলেছে, 'আপনাদের গ্রামের গরীবদের মধ্যে কি বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদ আছে? না কি, তারা দলের ব্যাপার-স্যাপার কিছু বোঝে? দু'মুঠো খাবার আর নিশ্চিন্ত জীবনের জন্য তারা আপনাদের পেছনে পেছনে ঘোরে, আপনারা যা আশা দেন, তারা বিশ্বাস করে, ফল যে কি, তা আপনি আমি, আমরা সবাই দেখছি। তবে, তবু যদি আপনি আমার মতামতের কথা জিজ্ঞেস করেন, তাহলে বলতে পারি, যাদের উপকারের জন্য শহরের আর গ্রামের আপনার মত লোকেরা লড়াই করছেন, এটা শেষ কথা না। গরীবরা নিজেরাই একদিন হয়তো লড়বে, নেতাও হয়তো তাদের মধ্য থেকেই জন্মাবে। সেইদিন সবকিছুর চেহারা বদলে যাবে।'

শংকরের মুখে কথাগুলো শুনে, দেবতোষের ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শিক্ষিত ছেলে। কলকাতায় তাদের বাড়ি আছে। সে কলকাতা আর শালচিতি যাতায়াত করে। চাটুয্যে বংশে সে-ই একমাত্র রাজনীতি করে। কলকাতা তার প্রধান বিচরণভূমি, শালচিতিতেও সে বিরোধী দলের কথা বাদ দিলে কম জনপ্রিয় না। কলকাতার কলেজে পড়ার সময় থেকেই সে গ্রামের রাজনীতিতে হাত পাকিয়েছে। সেই সময়ে গ্রামে আরও একজন নেতা ছিলেন। গান্ধীবাদী নেতা, বয়স্ক, রাধানাথ বসু! স্বাধীনতার পরে, প্রথম সাধারণ নির্বাচনে রাধানাথ শালচিতির এম. এল. এ. নির্বাচিত হয়েছিলেন। দেবতোষ নিজেই বলেছে, কলকাতায় কলেজে পড়ার সময় সে বামপন্থী রাজনীতিতেই বিশ্বাসী ছিল। পরে তার সে-বিশ্বাস ভেঙ্গে যায়, সে হয়ে পড়েছিল রাধানাথের শিষ্য। শংকর বুঝতে পারে, শালচিতির জমিদার চাটুয্যে বংশের ছেলের পক্ষে সেটাই হয়তো ছিল অনিবার্য। একে সুবিধাবাদ বলা যায় কি না, শংকর জানে না, ওর ধারণা অনুযায়ী মনে জিজ্ঞাসা জাগে, একে কি শ্রেণী চরিত্রের লক্ষণ বলে?

যাই হোক, শংকরের হাসতে হাসতে বলা কথাগুলো শুনে, দেবতোষ মনে মনে নিশ্চয়ই উত্তেজিত হয়েছিল, অবাক হয়েছিল।

তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কিছু কম ছিল না। বলেছিল, 'আপনি তো সাংঘাতিক কথা বললেন। অথচ বলছেন, আপনার কোন রাজনৈতিক মতবাদ নেই? আপনার রাজনৈতিক মতবাদ তো স্পষ্ট। আপনি কি কখনো কমিউনিস্ট পার্টি করেছেন নাকি? তা হলে তো দেখছি, আমি খাল কেটে ঘরে কুমির ঢুকিয়েছি।' কথাটা বলে দেবতোষ হেসে উঠেছিল।

শংকর মাথা নেড়ে বলেছিল, 'না, আমি কখনো কমিউনিস্ট পার্টি করি নি। আপনাদের পার্টিও করি নি। কিন্তু জীবনের চারপাশেই তো রাজনীতি। মনে তার কোন রি-অ্যাকশন হবে না, তা কখনো সম্ভব নয়। ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে, রাজনৈতিক দলগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখে, আমার এ রকম কথা মনে হয়েছে। মহাভারতে যদুবংশের কথাই ধরুন। আমি বলছি না, যদুবংশ ছিল সর্বহারা একটা শ্রেণী। কিন্তু সম্রাট জরাসন্ধ থেকে আর তার অনুচর রাজন্যবৃন্দ, কী ভাবে মথুরা থেকে যদুবংশকে তাড়িয়েছিল। বা ধরুন যদুবংশ ভয়েই পালিয়েছিল, প্রাণের তাগিদে। তাদের রক্ষা করার জন্য কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে নি, তাদেরই একজন, কৃষ্ণ যদুবংশের উত্থান ঘটিয়েছিলেন। সেই হিসাবেই আমি বলছি, গরীবদের নেতা হয়তো গরীবদের মধ্য থেকেই একদিন জন্ম নেবে। তাদের উত্থান ঘটবে। তবে একটা কথা আমি বিশ্বাস করি, আমাদের এই সময়ে, সব দলের সব নেতাই যে গরীবদের নিয়ে কেবল নিজের আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন, তা পুরোপুরি বিশ্বাস করিনে। ভালো লোকও নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু তাঁদের ক্ষমতাই বা কতোটুকু?' শংকর একটু থেমে বিব্রত হেসে বলেছিল, 'অবিশ্যি এ সব কথা আপনাকে বলার কোন মানে হয় না, অনেকটা মায়ের কাছে মাসীর গল্পের মত শোনাচ্ছে।'

'না না, আপনি বলুন, আমি শুনছি।' দেবতোষও সহজ হেসেই বলেছিল, 'আমি ধরেই নিচ্ছি, এ সব আপনার অভিজ্ঞতার কথা।'

শংকর বলেছিল, 'একজন অতি সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার কথা।'

'সেটা হয় তো ঠিক নয়,' দেবতোষ হেসে বলেছিল, 'সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে আপনার অভিজ্ঞতার ভাবনা চিন্তা আলাদা।'

শংকর হেসেছিল, 'আপনি যা ভাবেন। আমাদের সরকারি আমলা, পুলিশ, এদের চরিত্র আপনার অজানা নয়। যাদের নিয়েই আপনারা রাজত্ব চালাবার চেষ্টা করুন, এদের তো বাদ দিতে পারবেন না। এদের সংশোধন করা কি সম্ভব? আপনারা যে, যে-দলেরই নেতা হোন, আপনাদের পার্টিগুলো কি এমন সংহত, যে আপনাদের ক্যাডারদের দিয়ে আমলা পুলিশের জায়গা পূরণ করা যাবে? কিছু মনে করবেন না, আমি নিজেই বুঝি, আমার ভাবনা চিন্তা খুব স্পষ্ট নয়, হয়তো বাস্তবও নয়। কিন্তু বর্তমান অবস্থা দেখে, আমি কোন আশাও দেখতে পাইনে।'

'এতটাই যখন ভাবতে পারেন তখন রাজনীতিতে নামতে চান না কেন?' দেবতোষ জিজ্ঞেস করেছিল।

শংকর বলেছিল, 'ভাবা এক কথা, করা আর এক কথা। আমি অযোগ্য।'

'আপনি আমূল সংস্কারের কথা ভাবেন।' দেবতোষ বলেছিল, 'যা বোধ হয় খুব সহজ নয়।'

শংকর হেসে বলেছিল, 'না, আমূল সংস্কার নয়, আমি আমূল পরিবর্তনের কল্পনা করি। সহজ তো দূরের কথা, কবে হবে জানিনে।'

'তার মানে, বিপ্লব?' দেবতোষ ঘাড় বাঁকিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছিল।

শংকর নিজের মতোই হেসে বলেছিল, 'কথাটা তো এখন মুখে মুখে ঘোরে। কেমন যেন হাস্যকর শোনায়। আজকাল তো এরও অনেক ব্যাখ্যা শুনি, আসল সংজ্ঞাটা কী, তাই বোঝা যায় না। দেশের কোটি কোটি গরীব মানুষ ক'জন বিপ্লব বোঝে, বলুন? আমিও সেইরকম একজন অবুঝ।'

দেবতোষের সঙ্গে এ ধরনের কথাবার্তা একদিনে হয়নি। নানা

সময়ে নানা ভাবে হয়েছে। কিন্তু কোন তিক্ততার সৃষ্টি কখনো হয়নি। একজন বিশেষ দলীয় নেতার কাছে, শংকরের কথা নিশ্চয়ই ভালো লাগবার কথা না। তাও সেই দলীয় নেতার বিরুদ্ধ বিশ্বাস ধারণার কথা। সম্ভবত শংকরের কথাবার্তা আচার আচরণ, সর্বোপরি ওর রাজনীতি না করাই, কোন তিক্ততার সৃষ্টি করেনি। এবং দেবতোষের সঙ্গে রাজনীতি বিষয়ে কথাবার্তার সময়ে মনতোষ, মল্লিকা বা আরতিও অনেক সময় উপস্থিত থেকেছে। অতএব ও যে দেবতোষের রাজনীতির আদৌ সমর্থক না, তা সকলেই জানে। এমন কি কথাবার্তায় শংকর, দেবতোষের প্রশ্নের জবাবে হাসতে হাসতেই বলেছে, 'আপনাদের সম্বন্ধে আমাকে যদি কিছু জিজ্ঞেস করেন, তা হলে বলতে হয়, গ্রামীণ জীবনে আপনারাই সব থেকে সুবিধাভোগী শ্রেণী অর্থাৎ আপনাদের মতো গ্রামীণ সুবিধাভোগী শ্রেণী সকলেই এক।'

দেবতোষ জিজ্ঞেস করেছে, 'তা হলে আমাদের রাখালদা সম্পর্কে আপনি কী বলবেন? রাখালদাদের অবস্থা আমাদের থেকে খুব খারাপ নয়।'

রাখাল রায়, বর্তমানে যিনি এম. এল. এ., তাঁর কথাই জিজ্ঞেস করেছে। শংকর বলেছে, 'শ্রেণীর দিক থেকে আপনারা দুজনেই আমার কাছে সমান। আপনাদের দল আলাদা। কিন্তু আজকাল তো সব দলের শ্লোগানই প্রায় একরকম। তবে রাখালবাবুকে ব্যক্তিগত দিক থেকে আমি ভালো মনে করি। ওঁর সহনশীলতা, ভদ্রতা, দলের বিরুদ্ধ লোকের কথাও শোনা বা যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করা, এ সবই ওঁর গুণ, সেইজন্যই হয়তো উনি দলের নেতা হয়েও, দলের অনেকের কাছে অপ্রিয়।'

মনতোষ ফোড়ন কেটেছেন, 'ইয়ার মানে কি হে মাস্টার, নেতা হিসেবে আমার ভাইটি মন্দ লোক?'

শংকর জানে, মনতোষ হলেন জমিজমা সম্পত্তি বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত সতর্ক ব্যক্তি। চাটুয্যেদের কোথায় কতোখানি বেনামী জমি আছে, কোথায় কী ভাবে তার ব্যবস্থা করা আছে, সে সব দেবতোষের

থেকে তিনিই ভালো জানেন। দেবতোষও দাদার সেই চরিত্র জানে, এবং জেনে নিশ্চিন্ত আছে। সে হেসে বলেছে, 'আপনার ভাইকে মন্দ লোক বলিনি। তবে রাখালদার থেকে বয়সটা অল্প তো। ওঁর ঝাঁজ আঁচ একটু বেশি। তবে একজন সাক্ষাৎ ভদ্রলোক তো বটেই। দলের চ্যালাচামুণ্ডাদের আর একটু সামলে রাখতে পারলে, লোকে খুশি হয়।'

দেবতোষ হা হা করে হেসে উঠেছে, 'বেশ বলেছেন শংকরবাবু। কিন্তু রাখালদা কি তাঁর দলের ক্যাডারদের সামলে রাখতে পারছেন?'

'সেটা তো খুবই দুঃখের কথা। শংকর হেসে বলেছে, 'তবে সেটা আমাদের চোখে। দলের লোকের সঙ্গে ওঁর কী রকম আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং আছে, তা আর আমরা জানছি কী করে?'

দেবতোষ হেসে বলেছে, 'কথাটা বেশ ঘুরিয়ে নিলেন শংকরবাবু, সোজাসুজি কোন মতামত দিলেন না। তবে রাখালদার বিষয়ে আপনাকে আমিই বলছি, আমার বিরোধী দলের হলেও, রাখালদার মতো সৎ লোক পাওয়া কঠিন, আপনার কথাই ঠিক, বড় ভালো মানুষ। তবে রাজনীতিতে ভালো মানুষের জায়গা আছে কি না, আপনি আমার থেকে বেশি জানেন।'

শংকর ঠাট্টার সুরে হেসে বলেছে, 'তা হলে আপনাকে ভালো মানুষ বলবো না?'

এ কথা শুনে সবাই হেসে উঠেছে। দেবতোষ বলেছে, 'আপনার কথা শুনলে, আমাদের মধ্যে বনিবনা হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু আপনার কথায় রাগ ঝাল খোঁচা নেই, বিষ নেই, ঝগড়া করা যায় না। তবে আপনি মশাই সাংঘাতিক লোক যাই বলুন। ন' বউ আপনাকে মোটেই চেনে না।'

ন' বউ হলো দেবতোষের স্ত্রী মল্লিকা। মল্লিকার জবাব, 'শংকরদাকে আমি যতোটা দেখেছি, ও সব তোমাদের পলিটিক্স কোন দিন করতে দেখিনি। এ শংকরদাকেও আমি চিনিনে। শান্ত, ঠাণ্ডা, চুপচাপ, এমন তো ছিলেন না। হাসিখুশি টগবগে ছেলে, খেলাধূলো, ডিবেট, কতো কি নিয়ে থাকতেন। শুনতাম বিলেত যাবেন, বিরাট কিছু

করবেন। সব সময়ে ব্যস্ত। এমন কি শুনতাম ফিল্মের হিরোও হবেন ’

শংকর হো হো করে হেসে উঠেছে, এবং হাসতে গিয়ে নিজের সেই অর্থহীন স্বপ্নের দিনগুলো বুকের মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের খোঁচায় বিদ্ধ করেছে। দেবতোষ হেসে বলেছে, ‘যাকে বলে একেবারে রোমান্টিক হিরো। তোমাদের দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ ছিল না।’

মল্লিকার সহজ স্বীকারোক্তি, ‘তা সত্যি। প্রতিমার সঙ্গে ওদের বাড়ি অনেকবার গেছি, শংকরদা আমাদের পাত্তাই দিতেন না।’

শংকর বিব্রত লজ্জায় বলেছে, ‘না না, তা নয়। তখনকার আমি যে কেমন ছিলাম, নিজেই এখন আর তা বুঝতে পারিনে।’

যাই হোক শংকরের মনোভাব, এ বাড়ির সকলেরই জানা। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্কে ওর ধারণা দেবতোষের এবং এ বাড়ির বিষয়ে ওর দৃষ্টিভঙ্গি, কারোরই অজানা না। তথাপি কোন তিক্ততার সৃষ্টি হয়নি। বরং শংকর জানে, যে হেতু ক্ষমতাসীন দেবতোষের আমলে ওর চাকরি হয়েছিল, দেবতোষের দাদার ছেলেমেয়েদের ও পড়ায়, রাত্রে খায়, এবং দেবতোষেরই ব্যবস্থায় এ গ্রামে ওর জীবনযাপন মোটামুটি একটা ধারায় চলেছে, দেবতোষের বিরোধী দলের কারোরই তা পছন্দ না। তার থেকেও বেশি, সকলের এমন একটা ধারণা, ও যেন দেবতোষেরই দলের লোক। অতএব কিছুটা বিদ্বেষ মনোভাবও আছে। অথচ শংকরের কিছু করার নেই। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওরও পরিবর্তন হবে—অর্থাৎ দেবতোষের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে বিরোধীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে, এটাই সকলের ইচ্ছা। কিন্তু শংকরের পক্ষে তা সম্ভব নয়, তার কোন মৌলিক কারণও নেই। চালুনি এবং ছুঁচের, উভয়েরই ছিদ্র আছে। ওর কাছে সবাই সমান। এ মনোভাব অনেকের কাছে বিতর্কের বিষয় হতে পারে, ওর কাছে নয়। ও নিজেকে চেনে, বাকিদেরও বোঝে। ছাড়তে হলে, এ গ্রাম ছেড়ে, চাকরি ছেড়েই ওকে চলে যেতে হয়। তথাপি দেবতোষের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করার কোন কারণ বা ঘটনা এখনও কিছু ঘটেনি। তেমন করে ছাড়তে হলে তো

বনে গিয়েও আজ আর বাস করা সম্ভব না।

সম্পর্কচ্ছেদের প্রশ্ন কি এখানেই সীমাবদ্ধ? শংকর নিজেকে অতিমানব ভাবে না। দেবতোষের প্রতি ওর কিছুটা কৃতজ্ঞতাবোধও আছে। অতি দুঃসময়ে সে শংকরকে শালচিতিতে চাকরি, জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তার মধ্যে কোন আরোপিত শর্ত ছিল না। যাকে বলা যায়, দলীয় সমর্থনের শর্ত। তা ছাড়া, অস্বীকার করার উপায় নেই, এই পরিবারটির সঙ্গে ওর একটি প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। চাঁদু বেবি ওর স্নেহ কেড়েছে। সত্যি কথা, যে মল্লিকার দিকে অতীতে একদা ওর ফিরে তাকাবার অবকাশ ছিল না, আজ সেই মল্লিকা কেমন করে যেন ওর দৃষ্টিকে কোন এক অদৃশ্য থেকে আকর্ষণ করে রেখেছে। এ চিন্তাটা ওর মনে একটা বিব্রত বিষণ্ণতা ও অশান্তির সৃষ্টি করে। শংকরের আজ এই বয়সে, শালচিতির চাটুয্যে বাড়ির অন্দরে, মনটা হঠাৎ বিষণ্ণ বিস্ময়ে পিছন ফিরে তাকায়। মনে হয়, কী যেন ওর বুকের খাঁচায় অনাহুত ঘুরে ফিরে গিয়েছে, ও দেখতে পায়নি বা চায়নি। আজ বারে বারে সেই অনাহুতের দিকে তাকিয়ে মনটা বিমর্ষতায় ভরে ওঠে। কোন্ রাজনীতি আর সামাজিকতা দিয়ে, এই মানসিক অবস্থার বিচার হবে? আরতির হাসিখুশি প্রীতি ভরা বন্ধুত্বের ব্যবহার ওর মনে স্নিগ্ধতা এনে দেয়। মনতোষ জানেন, শংকর তাঁদের পরিবারের ক্ষতিকারক লোক না, সম্ভবত সেইজন্যই মনে মনে কিছুটা স্নেহ পোষণ করেন। সর্বোপরি, শংকর লোকের উপকারের জন্য কোন আদর্শ নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই, অতএব সমালোচকের ভূমিকা বলতে ওর কিছু থাকা উচিত না। 'তোমার ওপর নাই ভুবনের ভার' গানটির মতোই, এই পরিবারের বা গ্রামের কোন কিছুকেই ও পরিবর্তন করতে পারে না। যদিও ও নিজেকে জীবনের যতোটা অসহায় ও নির্বিকার দর্শক বলতে চায়, তা সম্ভব না। প্রতিক্রিয়া অবিশ্যিই ঘটে, তবু নির্বিকার থাকতে হয়।

শংকর চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললো, 'সেজদা, আমি কখনো বলিনি, দেবতোষবাবু গাঁয়ের লোকদের ঠকিয়েছেন। তবে মোদ্দা কথাটা তো আপনিও মানেন, যে যায় লংকায়, সেই হয় রাবণ।

আমি জানিনে, গুইরামের দল আমার বন্ধুর ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা খেয়েছে কী না, তবে দারোগার কথা আমি বলতে পারিনে।'

'দারোগা ত নিশ্চয় টাকা খেয়েচ্যে।' মনতোষ জোর দিয়ে বললেন, 'আমি হলপ করে বলত্যে পারি, ঐ গুইরামের দলও টাকা খেয়েছে। তা না হল্যে তোমার বন্ধুর ভাইয়ের রেহাই ছিল না। বলেছি তো, উয়ারা হল্য উপোষি ছারপোকা। গুইরামের সাজগোজের বহরটা দেখেছ? ব্যাটা এই সিদিনেও দু'বেলা ভাল করে খেত্যে পেতা নাই, এখন কেমন চেকনাই মারছে। শিবে চক্কোত্তি গাঁ কাঁপিয়ে মোটর সাইকেল ফটফটিয়ে বেড়াচ্ছে। ই সব কোথা থেক্যে হচ্ছে, আমরা জানি নাই? বাণ বন্যায় যায় যাতির খয়রাতিতে পঞ্চায়েত আর অঞ্চল প্রধানের হাতে লাখ লাখ টাকা, হিসাবের মা বাপ নাই। ইস্তক বি. ডি. ও., ওভারসিয়ার, দারোগা, সব টাকা খেয়ে ঢোল হচ্ছ্যে, লোকে কি কিছু দেখছে নাই? আমরা কি কানা?'

শংকর হেসে বললো, 'তা না হলে আর পোড়া দেশের লোকেরা কী জন্য রাজনীতি করবে, বলুন?'

'অই, তুমি কি বলতে চাও হে মাস্টার?' মনতোষ ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'আমাদের দেবু কি উয়াদের মতন সরকারি টাকা খেয়েচ্যে?'

শংকর হেসে আরতির দিকে তাকালো, তারপরে মল্লিকার দিকে। শংকর কিছু বলবার আগেই আরতি মুখ ঝামটা দিয়ে বললো, 'হুঁ, মাস্টার ঠাকুরপো কি সে-কথা বল্যেছে? ন'ঠাকুরপোর দলের লোকেরা কি সব সাধু নাকি? তুমি জান নাই?'

মনতোষ স্ত্রীর কথায় থমকে গেলেন। এমনিতে তাঁর যতোই হাঁক ডাক থাক, আরতি সচরাচর তার মধ্যে কোন কথা বলে না। কিন্তু একবার বললে, মনতোষ কেমন যেন অপ্রস্তুত আর নরম হয়ে যান। তিনি আরতির দিকে একবার দেখে, টেবিলে চাপড় মেরে বললেন, 'তবে আমি বলে দিলাম মাস্টার, তোমার দুর্নাম কেউ রুখতে পারবে নাই। আমি উয়াদের চিনি। থানায় টাকা পয়সা লেনদেনের সব ব্যাপার উয়ারা তোমার ঘাড়ে চাপাবে। চাপাবে কি, এমন থেক্যেই

রটাতে শুরু করেছে। ইয়ারা পরে শুনবে, বন্ধুর ভাইকে বাঁচাতে তুমিই টাকা খেয়েছ।'

শংকর বললো, 'সেজদা, কপালে যদি মিথ্যে কলংক থেকে থাকে, তবে তাই হবে। কিন্তু আমি তো জানি, কথাটা মিথ্যা।'

'তোমার জানা সব জানা নয় হে মাস্টার।' মনতোষ উঠে দাঁড়ালেন, 'গাঁয়ের লোকের জানাজানি অন্য রকম। ক'বছরে সেটা খানিক বুঝেছ, ইবারে আরো বুঝবে। আমি যাই, সন্ধে আহ্নিক কিছুই হয় নাই। তোমরা মাস্টারকে খাইয়ে দাও, আজ আর রাত কর নাই।'

আরতি বললো, 'মাস্টার ঠাকুরপো তো বলছিল ছেলেমেয়েদের পড়াবে।'

মনতোষ সন্দিগ্ধ অবাক চোখে আরতির দিকে তাকালেন। তারপরে মল্লিকার দিকে। মল্লিকা ঠোঁট টিপে হাসছিল। আরতির নাকের হীরায় ঝিলিক দিচ্ছিল। মনতোষ একবার দেখলেন শংকরের দিকে। মুখ ফিরিয়ে বাড়ির ভিতরে যাবার দরকার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, 'ই সব লেখাপড়া জানা পাগলদের আমি বুঝতে পারি নাই বাপু।'

আরতি খিলখিল করে হেসে উঠলো। মল্লিকা মুখে শাড়ির আঁচল চাপা দিল। শংকরও বিব্রত মুখে হাসলো, বললো, 'সেজ বউদি, আমি বরং আজ যাই। আমার খিদে-টিদে তেমন নেই।'

আরতি চকিতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে মল্লিকাকে দেখে নিয়ে বললো, 'কেন? জ্বর-টর এসেছে নাকি?'

মল্লিকার চোখে উদ্বেগ। শংকর বললো, 'বোধ হয় না। তবে ডাক্তার বলছিল, জ্বর-টর একটু হতে পারে। সেইজন্য না, আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'কী রে ন' তুই কি বুঝিস?' আরতি মল্লিকার দিকে ব্যগ্র চোখে তাকালো।

মল্লিকা বললো, 'সে-রকম বুঝলে, ভাত না হয় না খেলেন। দু-চারটে রুটি বা লুচি খান।'

শংকর কিছু বলবার আগেই আরতি বলে উঠলো, 'সেই ভালো। এ শরীরে আজ আর ভাত খেয়ে দরকার নাই, শরীর রসস্থ হবে। আমি যাই, বরং খান কয়েক লুচি ভাজি গিয়ে।'

শংকর বললো, 'না সেজ বউদি, লুচি না। বরং খান দুই রুটি করে দিন।'

আরতি তাকালো মল্লিকার দিকে। যেন মল্লিকার সম্মতিরই অপেক্ষা। মল্লিকা বললো, 'বলছেন যখন, তাই হোক। সেজদি থাকো, আমি যাচ্ছি।'

'না না, আমি যাচ্ছি, তুই থাক।' আরতি দ্রুত বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

শংকর টেবিলের দিকে মুখ নিচু করে দেখলো, তারপরে মল্লিকার দিকে। মল্লিকা অপলক চোখে শংকরের দিকে তাকিয়ে ছিল। শংকরের কাছে, এমন মুহূর্তগুলো একটা বোবায় পাওয়া অসহায় অবস্থার মতো। শংকরের সামনে, এ রকম একাকী মল্লিকাও যেন কেমন হয়ে যায়। ওর চোখে মুখে একটা আবেগ ফুটে উঠতে থাকে, অথচ কথা বলতে পারে না। দুজনেই যেন একটা ঘোরের মধ্যে হারিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত শংকরকেই, এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে কথা খুঁজে বের করতে হয়, এবং হেসে কথা বলার উদ্যোগ করে। তথাপি হঠাৎ কোন কথা যোগায় না। নির্বাক নৈঃশব্দের মধ্যেই যেন অনেক কথা বলা হয়ে যেতে থাকে, এবং আস্তে আস্তে মল্লিকার কালো ডাগর চোখে ও মুখে একটা বিষণ্ণ হাসি ফোটে। শংকরও হাসতে পেয়ে যেন কিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করে। ও জিজ্ঞেস করলো, 'দেবতোষবাবুর তো আজ কলকাতা থেকে ফেরার কথা ছিল, তাই না?'

মল্লিকা বললো, 'বুঝতে পারি, আপনার আর এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই।'

'এটা আমার কথার জবাব হলো না।' শংকর হাসলো, 'তোমাকে তো অনেকবার বলেছি, আমার নিয়তি আমাকে এই শালচিতিতে নিয়ে আসছে।'

শংকরের কথা শেষ হবার আগেই, মল্লিকার বিষণ্ণ হাসি চোখের কোণে জল চিকচিক করে ওঠে।

মল্লিকার চোখের কোণে জলের বিন্দু চিক চিক করে উঠতেই, শংকরের অস্বস্তি গভীর হয়ে ওঠে। উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কী হলো? আমি তো নতুন কোনো কথা বলে, তোমাকে কষ্ট দিতে চাই।নি।'

মল্লিকা দু'হাতে দুই চোখের কোণ মুছলো। মুখে বিষণ্ণ হাসি লেগেই ছিল। বললো, 'জানি, নতুন কথা বলেন নি, কষ্টও দিতে চান নি। তবে আপনার মুখে নিয়তির কথা শুনলে, আমার কথাটাই সত্যি প্রমাণ হয়ে যায়। নিয়তি আপনাকে এই শালচিতি গ্রামে, বিশেষ করে এ বাড়ীতে টেনে এনেছে। নিজের ইচ্ছেয় আপনি আসেন নি। উপায় থাকলে আসতেনও না।'

শংকরের বিব্রত হাসিতেও বিষণ্ণতার স্পর্শ লেগে আছে। সে বললো, 'আবার সেই পুরনো কথাটাই তোমাকে বলছি মল্লিকা। তুমি, আমি, আমরা,সংসারের অনেক মানুষকে দেখলেই মনে হয়, সবাই যে যার নিজের ইচ্ছেয় চলেছে। আসলে কথাটা তো সত্যি নয়। কতো পরাক্রমশালী বড় বড় মানুষকে দেখে আমরা ধারণা করি, তার নিজের ইচ্ছে মতোই সে সব কিছু করে বেড়াচ্ছে। এ কথাটা আমি মন থেকে আজকাল আর মেনে নিতে পারিনে। এ কথাও বলিনে, আমার কথাই সবাইকে মানতে হবে। আমার চোখে, সবাই অবস্থা আর পরিবেশের দাস। যে মানুষ হাতে দণ্ড নিয়ে হুংকার করছে, আর যে মানুষ হায় হায় করে কাঁদছে, তারা সকলেই তাদের জীবনের ক্ষেত্রে অসহায়।' শংকর কথা থামিয়ে শব্দ করে একটু হাসলো, 'যাক গে, এ সব বড় জট পাকানো জটিল কথা, এক ধরনের প্রলাপ বলতে পারো। তুমি নিজেই ভেবে ছাখো না, কখনো কি তুমি ভেবেছিলে, এই শালচিতির চাটুয্যে বাড়ির ন' বউ হয়ে আসবে?'

'না, তা কখনো ভাবি নি।' মল্লিকা বললো, 'যখন এসেছিলাম, তখন আপনার মতোই আমি নিয়তির কথা ভেবেছিলাম। এখনও

ভাবি। আপনিও ভাবেন, নিয়তিই আপনাকে এই শালচিতি গ্রামে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমার জীবনের নিয়তির বিধানকে, আজ আমার কাছে অনেকটা আশীর্বাদের মতো মনে হয়, তা নইলে এমন অদ্ভুত ঘটনা কেমন করে ঘটলো, শালচিতির চাটুয্যে বাড়িতে আপনি আমার সামনে বসে আছেন? অথচ আপনার নিয়তি আপনাকে আশীর্বাদ তো করেই নি, বরং দুঃখ আর যন্ত্রণার মধ্যে এনে ফেলেছে।'

শংকর মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনছিল। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বললো, 'মল্লিকা, তোমার এ কথার জবাবও আমি অনেকবার দিয়েছি। আদর্শের কথা বলবো না, কিন্তু জীবনে আমার কোনো বিশ্বাস নেই, তা নয়। আমি যদি রাজনীতি করতাম, তা হলে আজ এ বাড়ীতে তোমার সামনে বসে থাকার কথা নয়, কারণ দেবতোষবাবুর রাজনীতির প্রতি আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস বা আস্থা নেই। রাজনীতি করিনে বলেই, এ বাড়ীতে আমার ঠাঁই হয়েছে। দেবতোষবাবুও আমার ওপরে তেমন কোনো শর্ত আরোপ করেন নি। আমি কাজ করি, খাটি, খাই। এ কথা কে বলতে পারে, যে যেখানে কাজ করে. খেটে খায়, সেখানে তার মনের মতো আদর্শ জায়গা হবে, বা মনের মতো মালিক হবে। সেদিক থেকে সেজ বউদির ছেলে মেয়েকে পড়িয়ে এ বাড়ির অন্নগ্রহণে আমার মনে কোনো গ্লানি নেই। কিন্তু তা ছাড়াও আর একটা কথা তোমাকে বলছি, সুখের কথা জানিনে, তোমাকে এ বাড়িতে দেখে, আমার অতীতটাই যেন একটা অবাক পরিবর্তনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। প্রতিমার বন্ধু হিসাবে তোমার দিকে কখনো তাকিয়ে দেখবার অবকাশ হয় নি। আজ তোমাকে এখানে দেখে, নিজের জীবনের মিথ্যে রোমান্টিকতা আমাকে বিদ্রূপ করে। আমার দুঃখ আর যন্ত্রণাটা তোমার কল্পনা মাত্র তোমার সান্নিধ্যে এসে আমি আবার নিজেকে নতুন করে দেখতে শিখেছি। কিন্তু দোহাই, আমাকে ভুল বুঝো না যেন, এই দেখতে শেখার ব্যাপারটা, আসলে আমার ভেতরের সামান্যতা, নিতান্ত সাধারণ মানুষটাকে জানা।'

'ভয় নেই শংকরদা, আমার দ্বারা আপনার সম্মান কখনো নষ্ট হবে

না।' মল্লিকা বিষণ্ণ হেসে কথাগুলো বললেও, ওর স্বরে বাষ্পোচ্ছাসের রুদ্ধতা গোপন রইলো না। এক মুহূর্ত দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে চুপ করে, নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'তবে আমার মনের কথা তো আমার নিজেরই। মেয়েদেরও নিজের মনের চিন্তার স্বাধীনতা আছে। সে-কথা বলে আপনাকে ব্যস্ত বিরক্তও করতে চাইনে। অনেক সময়ে, অনেক রকমে যে কথাটা বলতে চেয়েছি, আমার সে-কথাটা রাখবেন। যতো যাই ঘটুক, এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন না, এটা আমার—।' মল্লিকার রুদ্ধ স্বর বুকের গভীরে ডুবে গেল।

শংকরের মুখে অসহায় বিষণ্ণ হাসি। ও কোনো জবাব দেবার আগেই, বড় ঝকঝকে কাঁসার থালা হাতে নিয়ে, আরতি ভিতর বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকলো। সে মল্লিকার দিকে চকিতে একবার দেখলো। তার হীরের নাকছাবির ঝলকে, ঠোঁটের কোণের হাসিটি অসম্পূর্ণ হলেও, খুব স্বাভাবিক ভাবেই শংকরের সামনে টেবিলের ওপর থালা বসিয়ে দিল। তার পিছনে পিছনেই এক গলা ঘোমটা টেনে, বাড়ির এক দাসী এক হাতে মিষ্টির বাটি আর এক হাতে জলের গেলাস নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ালো। আরতি পিছন ফিরে দরজার দিকে যেতে যেতে শংকরকে বললো, 'নিন, গরম গরম খেতে শুরু করুন মাস্টার ঠাকুরপো।' দরজার কাছে গিয়ে দাসীর হাত থেকে মিষ্টির বাটি আর জলের গেলাস এনে থালার দু'পাশে রাখলো। বিরাট বগি থালার ওপরে রাখা ডাল আর মাছের ঝোলের বাটিও নামিয়ে দিল। তা ছাড়াও রয়েছে থালার একপাশে বেগুন ভাজা। লুচির সংখ্যা কম করে এক ডজন, এবং তা থেকে খাঁটি গব্য ঘৃতের গন্ধ ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

শংকর অবাক চোখে তাকিয়ে সবই দেখছিল। বললো, 'কিন্তু সেজ বউদি, আমি তো আপনাকে খান দুয়েক শুকনো রুটি সেঁকে দিতে বলেছিলাম। আপনি লুচি করতে গেলেন কেন?'

'ভেবে দেখলাম, ঘা শুকোবার জন্য আপনার এখন লুচি খাওয়াই দরকার।' আরতি বলল।

আরতির চোখে ঠোঁটে নাকছাবিতে একসঙ্গেই ঝিলিক দিল। চোখ

ঘুরিয়ে একবার দেখলো মল্লিকার দিকে, 'জানেন তো, মেয়েদের ছেলে হবার পরে, তাদের ঘি খেতে দেওয়া হয়। আমি সময় তো বেশি নিই নি।'

মল্লিকা ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে। শংকর তার দিকে একবার তাকিয়ে হেসে বললো, 'কিন্তু সেজ বউদি, আমি তো সন্থ প্রসূতি নই। আর শরীর ভালো থাকলেও, এতগুলো লুচি কখনো খেতে পারিনে। আপনি আর যাই করুন, খান চারেক লুচি রেখে বাকি সব তুলে নিন। আমার সত্যি খিদে নেই। আর এত মাছ মিষ্টিও আমি খেতে পারবো না।'

আরতি জিজ্ঞাসু চোখে মল্লিকার দিকে তাকালো। মল্লিকা ভুরু কুঁচকে বললো, 'তোমার মাষ্টার ঠাকুরপোর সব ব্যাপারে কি আমাকে জবাব দিতে হবে নাকি? খেতে দিয়েছো তুমি, খাবেন উনি, যা করবার তোমরাই কর। আমি তো শংকরদার কথা মতো তোমাকে রুটি করতেই বলেছিলাম। তুমি নিজের ইচ্ছেয় লুচি করে এনেছো, আর নিজের ইচ্ছে মতো খাওয়াতে পারছো না?'

'তা আর পারছি কোথায় রে ন'?' আরতি হুস করে একটি কপট নিশ্বাস ফেলে বললো, 'মাষ্টার ঠাকুরপোটি আমার মনের মতো মানুষ বটে, আমি তো তার মনের মতো নই। সে যা করবেন, সবই তোর মুখের দিকে তাকিয়ে করবে। তোদের ভাত পুরনো চালের মতো বাড়ে, আমি নতুন চালের মতো গলে ধসে যাই। আমার কথায় কি কাজ হবে?'

শংকর হা হা করে হেসে উঠতে গিয়ে, তাড়াতাড়ি কপালে হাত রাখলো। খেয়াল ছিল না, কপালে ক্ষতে সদ্য সেলাইয়ের যন্ত্রণাটা এখনো টনটন করছে। আরতি ঝটিতি শংকরের কপালে হাত ছোঁয়াতে গিয়েও, না ছুঁইয়ে, উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হলো মাষ্টার ঠাকুরপো, লাগলো?'

'হাঁা, হাসতে গিয়ে কপাল ব্যথা যাকে বলে।' শংকর বললো।

মল্লিকা আরতির দিকে তাকিয়ে হাসি চেপে বললো, 'সত্যি, তোমার মুখে কোনো কথাই আটকায় না সেজদি। তোমার মনের

মতো মাস্টার ঠাকুরপো আর তোমার মাঝখানে তো আমি বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। তোমাদের যেমন ইচ্ছে, তেমনি চললেই পারো।'

'কথাটা কি বুকে হাত দিয়ে বললি না?' আরতি তার নিজের বুকে হাত ঠেকিয়ে, চোখের কোণে তাকিয়ে হেসে বললো, 'আঁতের কথা না দাঁতের কথা, সেটুকুনি বুঝি। সত্যি সত্যি যিদিনে কেড়ে নেব, সিদিনে বুঝতে পাববি। তখন সেজদির রক্ত দিয়ে পায়ে আলতা পরবি।' ঠোঁট টিপে তাকালো শংকরের দিকে।

শংকরের মুখে বিব্রত অস্বস্তির হাসি। জানে, সেজ বৌদির কথার মধ্যে আদৌ কোনো সত্যি নেই, ঈর্ষা বিষের বিন্দুও নেই, সবটাই ঠাট্টা। তবে সে নিজে একজন সংসার পটিয়সী নারী। মল্লিকার মন তার একেবারে অজানা না। এবং এটাও জানে, শংকর মল্লিকার সম্পর্কের মধ্যে পাপ বাসা বাঁধে নি। বরং শংকরকে কেন্দ্র করে, মল্লিকার প্রতি তার একটি সস্নেহ প্রশ্রয়ই আছে, যা শংকরের কাছে অতি অস্বস্তিকর। শংকর অনুমান করতে পারে না, আরতি নিজে কতটা সুখী। অসুখী হলেও, হাসির ছটায়, চোখের ঝিলিকে, স্বাস্থ্যের তারুণ্যের তরঙ্গে, সংসারে সে সর্বদাই চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইঙ্গিতবাচক ঠাট্টার কথায় সে কোনো সীমারেখা টানতে জানে না

মল্লিকা বললো, 'কার কাছ থেকে কাকে কেড়ে নেবে সেজদি? তুমি কি আমার সতীন, যে তোমার রক্তে পায়ে আলতা পরবো?'

আরতি কিছু বলবার উদ্যোগ করতেই, শংকর তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বললো, 'সেজ বউদি, দোহাই চুপ করুন। আপনারা কে আমাকে কার কাছ থেকে কাড়বেন? আমি তো আপনাদের সকলের ভালবাসার আশ্রয়েই আছি।' আরতি ঠোঁট টিপে হেসে, শংকরের থালা থেকে খান কযেক লুচি তুলে নিয়ে, চলে যেতে যেতে বললো, 'সকলের ভালোবাসাটা ফাঁকির কথা। জোড়ায় পিরিত, জোড়ায় কিরিত, আমি তো তাই জানি।' দরজা দিয়ে অদৃশ্য হবার আগে, তার রুদ্ধ হাসির ঝংকার শোনা গেল।

শংকর ভিতর দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল। আরতি অদৃশ্য হয়ে যাবার পরে, মুখ ফিরিয়ে তাকালো মল্লিকার দিকে।

মল্লিকা হেসে বললো, 'কী হলো? খান।'

'হ্যাঁ, খাবো তো নিশ্চয়ই।' শংকর ফুলকো লুচিতে আঙুলের চাপ দিল, 'সেজ বউদির কথাগুলো এক এক সময় আমার মাথার মধ্যে কেমন ঝলমলিয়ে ওঠে। ওঁকে আমি এখনও বুঝতে পারিনে।'

মল্লিকা বললো, 'সেজদিকে বোঝার কিছু নেই। তার মন আর মুখে আলাদা কিছু নেই, তা হলে ও রকম করে কেউ বলতে পারে না।'

শংকর মুখে খাবার না তুলে আবার মল্লিকার দিকে তাকালো। মল্লিকাও তাকিয়েছিল। শংকর বললো, 'হয়তো তাই সত্যি, কিন্তু আমার অস্বস্তি হলো, যার কোনো ভিত্তি নেই, সেই ব্যাপারটাকেই সেজ বউদি বড় বেশি স্পষ্ট আর প্রখর করে তুলতে চান।'

মল্লিকার বিষণ্ণ আয়ত চোখের তারা দুটো এক মুহূর্তের জন্য দীপ্ত হয়ে উঠলো। ঠোঁট টিপে তাকিয়ে রইলো শংকরের দিকে। আস্তে আস্তে আবার ওর চোখে মুখে নম্র বিষণ্ণতার ছায়া নেমে এলো। মুখ ফিরিয়ে, ভিতর দরজার দিকে যেতে যেতে বললো, 'সত্যি, কোনো ভিত্তি যে নেই, এ কথা সেজদি কেন যে বুঝতে পারে না জানিনে। এবার থেকে আমিই বলে দেবো, সেজদি যেন এমন ভুল আর না করে।'

'মল্লিকা!' শংকর অস্বস্তিকর অবাক স্বরে ডেকে উঠলো, 'আমার কথাটা তুমি হয়তো বুঝতে পারো নি। আমি কি বলতে চেয়েছি—।'

'আপনি বলতে চেয়েছেন, যার কোনো ভিত্তি নেই।' মল্লিকা ভিতরে যাবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কিন্তু কোনো ভিত্তি যে নেই, এ কথাটা আমারও জানা ছিল না শংকরদা।' কথায় শেষের দিকে ওর স্বর ঝাপসা হয়ে এলো।

শংকর কিছুটা ত্রস্ত ব্যগ্র স্বরে ডাকলো, 'মল্লিকা!'

মল্লিকা গম্ভীর মুখে, আয়ত চোখ তুলে তাকালো। শংকর বললো, 'আমি কথাটা হয় তো ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারি নি, অথচ ভেঙে বলতেও অস্বস্তি হয়। আমি ভিত্তির কার্যকারিতার কথাই বলতে চেয়েছিলাম। কথাটাকে জটিল করে তোলার কোনো কারণ

নেই। আমার শরীরটাও ভালো লাগছে না, এত কথাও আমার বলতে ইচ্ছে করছে না। খিদে আমার নেই, আগেই বলেছিলাম, আমি বরং এখন যাই।' সে চেয়ার ছেড়ে ওঠার উদ্যোগ করলো।

'দোহাই শংকরদা।' মল্লিকা দ্রুত পায়ে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো, 'আমি সহজ কথাটাই হয় তো সব সময়ে সহজে বুঝে উঠতে পারিনে। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি না খেয়ে চলে গেলে, আমার লজ্জা সব থেকে বেশী।'

শংকর চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়েও আবার বসলো। ইতিমধ্যেই মনটা ওর নিজের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছে। কারণ, ও জানে, অনুভূতিসম্পন্ন মল্লিকা ওর কথাটা বুঝতে ভুল করে নি। এবং ভুল কথাটা বেরিয়েছে ওর মুখ থেকেই। আসলে নিজেকে কৃতজ্ঞ আর বিশ্বাসী ভাবতে গিয়ে, মনের গভীরের সত্যটাকেই ও অস্বীকার করতে চেয়েছে। 'কার্যকারিতা' কথাটা নেহাতই জোড়াতালি দেওয়া। মল্লিকা আর ওর সম্পর্কের কোনো ভিত্তি নেই, এ কথাটা একেবারে অস্বীকার করার মতো মিথ্যা আর কিছু নেই। কিন্তু সে-সম্পর্ক নিস্ফল এক কষ্টকে নিরন্তর বাড়িয়ে তোলা ছাড়া, অন্য কোন গতি নেই। শংকর ওর অতীত জীবনের কথা ভেবে, নিজেকে বিদ্রূপ করেই একটু হাসলো, বললো, 'ক্ষমাটা আমারই চাওয়া উচিত, লজ্জা তোমাকে আমি কোনো রকমেই দিতে পারিনে।' বলে সে খেতে আরম্ভ করলো। খেতে খেতেই ও পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে গেল, 'তোমাকে তখন জিজ্ঞেস করছিলাম, দেবতোষবাবুর কথা। আজ তো ওঁর ফেরবার কথা ছিল।'

'ছিল, কিন্তু দুপুরে টেলিফোন করে জানিয়েছে, ফিরতে আরও দুদিন দেরি হবে।' মল্লিকা বললো, 'ওর কাজের ব্যাপার-স্যাপার তো আমি কিছু বুঝিনে। দিল্লী থেকে নাকি কোন্ নেতা আসবে, তার সঙ্গে কথা বলবার জন্য দু'দিন ফেরা হবে না।'

শংকর খেতে খেতে কথাগুলো শুনলো। মনে পড়লো, কেন্দ্রের সরকারি পাঁচ-মিশেলি দলে নানা বিতর্ক আর জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। নেতাদের মধ্যে পরস্পরের দোষারোপ শুরু হয়ে গিয়েছে।

এটাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল। নেতৃত্ব নিয়ে নিজেদের মধ্যে নির্লজ্জ নগ্ন দ্বন্দ্ব আর সম্পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি, আত্মকেন্দ্রিকতা আর গোষ্ঠী পুষ্টিকরণ, কোনো কিছুতেই রাখ ঢাক নেই। দিল্লীর বর্তমান চিত্র আদৌ শুভ না। কোনোকালেই কি ছিল? শংকর মনে মনে মাথা নেড়ে ভাবলো, রাজনীতির বর্তমান গতিবিধি দেবতোষবাবুর দলের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়।

শংকর সামান্য খেয়ে উঠে পড়লো। মল্লিকা উদ্বিগ্ন স্বরে বললো, 'কিছুই যে খেলেন না?'

'আর পারছিনে।' জলের গেলাস হাতে শংকর উঠে দাঁড়ালো। ঘরের এক কোণে জাল দিয়ে ঘেরা নালি মুখের কাছে গিয়ে, হাত ধুয়ে, গেলাসে চুমুক দিয়ে জল খেলো। ফিরে এসে টেবিলে গেলাস রেখে বললো, 'চলি।'

মল্লিকা বললো, 'কাল সকালে হরিকে পাঠিয়ে খবর নেবো, কেমন আছেন।'

'ভালোই থাকবো, এমন আর কী হয়েছে।' শংকর হেসে বললো।

আরতি ঢুকলো হাতে একটি টর্চ লাইট নিয়ে। 'এটা নিয়ে যান। ভালো যে কেমন আছেন, তা চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।' টর্চ লাইটটা শংকরের দিকে বাড়িয়ে দিল। খাবারের থালার দিকে তাকিয়ে, মুখ গম্ভীর করে বললো, 'খাবার রান্না করাই সার। তার ওপরে আবার দায়িত্ব দিয়ে গেছি ন'মেয়ের ওপর। যেমন খাবার তেমনি পড়ে আছে।'

মল্লিকা বললো, 'আমি কী করবো? খেতে তো বললাম।'

'শুধু বলে কি আর খাওয়ানো যায়?' আরতির চোখে ঝিলিক হানলো, 'খাওয়াতে জানতে হয়।'

শংকর হাসতে হাসতে বাইরের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

শংকরের টর্চের আলো প্রথমে পড়লো ডানদিকের একটি ডোবার দিকে। শালচিতির লোকেরা এ রকম ডোবাকে গড়াও বলে। ডোবা

পেরিয়েই, ডানদিকে বাইরের বাড়ির উঠোন, অন্ধকারে যায় সবখানি দেখা যায় না। পুব মুখে একটি আটচালা। শংকরের বাড়িওয়ালা মুখুজ্জেদের এই আটচালাতেই পূজা পার্বণ হয়। তবে নামেই আটচালা। খড়ের চালের মাঝখানে খড় নেই, বড় বড় ফাঁক। মাটি দিয়ে ইঁটের গাঁথনির থাম যতোগুলো থাকার কথা, তা নেই। বাঁশ দিয়ে, কোনো রকমে ঠেকো দিয়ে রাখা হয়েছে। আটচালাটা আসলে পূজাপার্বণের স্থান না। তার পাশেই একটি উঁচু ছাওয়া চারচাল মাটির ঘর আছে। সেটিকেই ঠাকুর দালান বলা হয়। সব কিছুরই পড়ো পড়ো অবস্থা। কারণ মুখুজ্জেদের নিজেদের অবস্থাই পড়তি। এক সময়ে নাকি দোল দুর্গোৎসব হতো। শংকর এসে অবধি সে-সব কিছুই দেখে নি। বিশেষ বিশেষ পার্বণে বাড়ির বউয়েরা উপোষ করে, ঘট পুজা করে। নৈবেদ্যের পাত্রগুলো দেখলেই দারিদ্রের ছবিটা আর অস্পষ্ট থাকে না।

বাইরের উঠোনের বাঁদিকে একটি বড় জামরুল গাছ। আটচালার পাশ দিয়েই, ভিতর বাড়িতে ঢোকার মুখে, শংকরের মাটির দোতলার ঘর। বাড়ির ভিতরেও সামনে পিছনে দুটো উঠোন, চারপাশে যখন যেমন প্রয়োজনে ঘর তোলা হয়েছে। সবই শরিকানায় ভাগাভাগি। ভিতর বাড়িতে ঢোকার একটি ইঁটের পাচিলের গায়ে একটা দরজা ছিল। বাড়ি ঘিরেও ছিল ইটের পাচিল, যদিও ঘর সবই মাটির আর খড়ের চালের। কিন্তু ইঁটের পাচিল এখন নানা জায়গায় ভেঙে পড়েছে। দরজার কাঠের পাল্লা দুটো নেই।

শংকরের একটাই সৌভাগ্য, তাকে ভিতরে বাড়িতে ঢুকতে হয় না। তার ঘরে ঢোকার দরজা বাইরের উঠোনের দিকে। আসলে আটচালা সংলগ্ন, শংকরের বর্তমান মাটির দোতলাটি আগে মুখুজ্জেদের বৈঠকখানা ছিল। নিচের ঘরে বাড়ির কর্তা বৈঠক করতেন, বিশ্রামের সময় ওপরে যেতেন। কিন্তু সে-কর্তাও নেই। সে দিনকালও নেই। দোতলা বৈঠকখানা ঘরটি এখন মুখুজ্জেদের তিন শরিকের সম্পত্তি। শংকর পনেরো টাকা ভাড়া দেয়। কিন্তু তিন শরিককে আলাদা আলাদা পাঁচ টাকা করে দিতে হয়। দেবতোষই ব্যবস্থা করে

দিয়েছিল। তাও, প্রথমে শংকরকে ভাড়া দিতে আপত্তি ছিল, কারণ সে কায়স্থ, শালচিতির ব্রাহ্মণদের ভাষায় 'শুদ্দ্‌র'। আপত্তির কারণটা অবিশ্যি, গ্রাম সমাজের ভয়। দিনকালের আধুনিকতা, জাতপাতের বড় বড় যতো কথাই হোক, গ্রামের বাইরের চেহারার পরিবর্তন হলেও, ভিতরের চেহারার পরিবর্তন উনিশ বিশ। তবে, প্রস্তাবক ছিল স্বয়ং দেবতোষ চাটুয্যে, গ্রামের একজন মাতব্বর, জমিদার বাড়ির ছেলে। শংকর যুবক হলেও, সে যে একজন শিক্ষিত মানুষ, এটা সে বোঝাতে পেরেছিল। তাছাড়া, পনেরোটা টাকাও কম না।

শংকরের সেই প্রথম গ্রামের অভিজ্ঞতা। মাটির ঘরের দোতলা হতে পারে, তাও ওর জানা ছিল না। মাটির সিঁড়ি, বারো ধাপে তিনটি বাঁক। এমন কি জানালাও আছে। খুব ছোট দুটো জানালা। কিন্তু আলো আসে, বাতাসও আসে। দরজা বন্ধ করে দিলে নিচের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না। এমন কি, ঘরের এক কোণে ছোটখাটো প্রাকৃতিক কর্মের জায়গাও আছে। কিন্তু শংকর রাতবিরেতেও কখনো সেই প্রাকৃতিক আগারটি ব্যবহার করতে পারে না। কেন না ওটার কোনো আড়াল নেই, যাকে বলা যায় এ্যাটাচড্‌ ইউরিনাল। সে রকম প্রয়োজন হলে, ও দরজা খুলে বাইরেই যায়। যদিও গ্রীষ্মকাল ছাড়া, ওপরের ঘরে ও কখনোই রাত্রি বাস করে না। বর্ষাকালে খড়ের চাল দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ে। নিচের ঘরে তা পড়ে না। তবে, বাথরুম পায়খানা বলতে যা বোঝায়, তার কোনো অস্তিত্বই নেই।

শংকর প্রথম যখন এসেছিল, রীতিমতো সংকটে পড়ে গিয়েছিল। বাড়ির কাছে পিঠেই দুটো ডোবা ও বাঁশঝাড় আর আঁকুড় গাছের ঝোপ ঝাড়। মেয়ে পুরুষরা ভাগাভাগি করে, প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য সেখানে যাতায়াত করে। শংকরের পক্ষে সেটা ছিল অসম্ভব। সত্তরের দশকেও গ্রামে ঐ রকম প্রিমিটিভ ব্যবস্থা থাকতে পারে, কলকাতার কৈশোরের ও যৌবনের প্রারম্ভে নিজেকে গ্যারিবল্ডির স্বপ্নে দেখা, যুবকটি ভাবতে পারে নি। সে সংকট থেকে উদ্ধারের

পথটা ও নিজে আবিষ্কার করতে পারে নি। এ মুখুজ্জে বাড়িরই বড় তরফের সেজ ছেলে গজানন ওকে পথ বাতলে দিয়েছিল, 'শুনেন ক্যানে মাষ্টারবাবু, উ সব গড়া ডোবার ধারে আপনি যেত্যে পারবেন নাই। আপনি উত্তর বাগে চিতির ধারে জঙ্গলে চল্যে যান। টুকুস হাঁটতে হবে বটে, তবে শান্তিতে কাজ সারতে পারবেন।'

গজাননের উপদেশ খুবই কাজে লেগেছিল। কেবল প্রাকৃতিক কাজ না, জায়গা বুঝে, চিতির বিস্তার যেখানে চওড়া, জল কিছু গভীর, শংকর সেখানে একেবারে স্নান সেরে ফিরে আসে। প্রাতঃভ্রমণ থেকে শুরু করে, স্নান, এখন বেশ ভালোই লাগে। গ্রাম জীবনের এ অভিজ্ঞতাটা এখন খারাপ লাগে না। আটত্রিশ বছরের জীবনে, অনেক পরিবর্তনের মধ্যে, এ পরিবর্তনটা এখন আর ওকে বিচলিত করে না। কেবল মানিয়ে নেওয়া না, বরং ভালোই লাগে।

মল্লিকার কাছে পরিচয় পেয়ে, দেবতোষ শংকরকে অনুরোধ করেছিল, তাদের বাড়িতে থাকতে। শংকর বিনয়ের সঙ্গে তা অস্বীকার করেছে। বলেছে, 'দেবতোষবাবু, চাকরির ব্যাপারে আপনি আমাকে যাচাই করে নিয়েছেন, আমার নিজেকেও একটু যাচাই করতে দিন। এতোকাল কেবল গ্রামের কথা শুনেই এসেছি, আর অনেক বড় বড় কথা বলেছি। দেখি না, আমিও আর দশজন গ্রামের বাঙ্গালীর মতো জীবনটাকে কাটাতে পারি কী না। আপনি মল্লিকাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন।'

দেবতোষ তথাপি নানা কথা বলেছিল। মল্লিকার মুখে শংকরের অতীত জীবনযাপনের কথা শুনে, সহজে ছাড়তে চায় নি। তথাপি ছাড়তে হয়েছিল। শংকরের স্বভাবসিদ্ধ হাসি ও নম্রতার মধ্যে একটা দৃঢ়তা ছিল। দেবতোষ আর মল্লিকা, দুজনেই তা বুঝেছিল।

শংকর আটচালার টর্চ লাইট জ্বেলে, নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতেই, ভিতর বাড়ির মেয়ে পুরুষ শিশুদের নানা স্বর শুনতে পেলো। এ সময়ে বাড়ীর পুরুষরা অধিকাংশই বাউরিপাড়া থেকে একটু মেজাজ শরীফ করে ফিরে আসে। কেউ কেউ দেরিতেও ফেরে। ঝগড়াঝাটি, হাসি, মাতালের প্রলাপ, শিশুর কান্না, সব মিলিয়ে এই সময়টা বাড়ির

ভিতর মোটামুটি বেশ সরগরম থাকে। তবে বেশিক্ষণ না। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই, অর্থাৎ রাত্রি ন'টা বাজার আগেই, গোটা বাড়ি নিঝুম হয়ে যাবে।

শংকর অন্যান্য দিন যখন ফেরে, রাত্রি ন'টার পরে ফেরে। বাড়ির ভিতরটা তখন নিশ্চুপ থাকে। কারণ বেশিক্ষণ বাতি জ্বালিয়ে রাখার মতো বিলাসিতা প্রায় কোনো শরিকেরই নেই। ভোরের অন্ধকারেই আবার সবাই জেগে ওঠে। শংকর আটচালার পাশ দিয়ে, ভিতর বাড়ির দরজার পাশেই, ওর নিজের ঘরের দাওয়ায় টর্চের আলো ফেললো। তার আগেই ওর চোখে পড়েছে, দাওয়ার ওপরে ঘরের দরজার কাছে, টিম টিম করে একটা চৌকো লণ্ঠন জ্বলছে। লণ্ঠনের পাশে, প্রায় কাঁথার মতো মোটা কিছু গায়ে জড়িয়ে যে মূর্তিটি বসে ছিল, টর্চের আলোয় তাকেও চিনতে পারলো। টর্চের আলো না থাকলেও, গজাননকে চিনতে অসুবিধা হবার কথা না। এ সময়ে গজানন রোজই তার ঘরের দরজার সামনে বসে থাকে। শংকর নিজে কোনো দিন ঘরে তালা লাগাবার কথা না ভাবলেও, গজানন ছাড়বার পাত্র না। তার এক কথা, 'আপনার কি মাথা খারাপ হঁইচে মাস্টারবাবু, ঘর খোলা রেখ্যে বাইরে যাবেন?'

শংকর হেসে বলেছিল, 'আমার আর চুরি যাবার ভয় কি আছে গজানন। জামাকাপড়?'

'জামা কাপড়?' গজানন তার তিরিশ-বত্রিশ বছরের অকাল বার্ধক্যের কালো মুখ কুঁচকে বলেছিল, 'মায় গামছাটা পর্যন্ত শালারা লিয়ে লিবেক, একটা ছুঁচো ইঁদুরকেও বিশ্বাস নাই। তা ছাড়া, ট্যাকা পয়সা কুথা রাখবেন? ট্যাঁকে বেঁধে লিয়ে তো ঘুরবেন নাই? আপনার উ বাক্‌সো ভেঙে সব লিয়ে যাবেকগা।'

শংকরের সে-ভাবনাটা নেই, কারণ ইস্কুলের মাইনে পাবার পরে, সব টাকাটা পোস্ট অফিসে জমা থাকে। নিজের খরচের জন্য যৎসামান্য টাকা ওর নিজের কাছেই থাকে। খরচের মধ্যে সকাল বেলার চা মুড়ি। সস্তা দামের দু-তিন প্যাকেট সিগারেট আর দেশলাই, বাকি টুকটাক সামান্য খরচ। যেমন স্বয়ং এই গজাননের

জন্যই দৈনিক চার আট আনা বরাদ্দ আছে। যে-বাউরি বুড়ি রুকুদিদি ঘর দরজা ঝাঁট পাট দিয়ে মোছে, তার মাস মাইনে আট টাকা ছাড়াও, মাঝে মধ্যে দু-এক টাকা দিতে হয়। সংসারে কারোরই যেমন প্রয়োজনের শেষ নেই, রুকু দিদিরাই বা থাকবে কেন?

তবে খাবার জলটা গজানন নিজেই এনে দেয়। শংকর হলোই বা কায়স্থের ছেলে, তা বলে বাউরির হাতের জল তো খাওয়া চলে না। অতএব 'শুদ্দুর' শংকরের খাবার জলটা গজানন মুখুজ্জে নিজেই টিউবওয়েল থেকে এনে দেয়। প্রথম দিকে শংকরকে ব্রাহ্মণ বাড়ীতে ঘর ভাড়া দিতে যে প্রতিরোধটা ছিল, সেটা নিতান্তই গ্রামের মুখ রক্ষার জন্য। এখন এই মুখুজ্জে বাড়ির সব শরিকই মোটামুটি শংকরের প্রতি প্রসন্ন। জাতপাতের কথাটাও কেউ তোলে না।

কিন্তু গজানন যে কেমন করে প্রথম থেকেই শংকরের এক রকমের অভিভাবক হয়ে উঠেছিল, শংকর নিজেও খেয়াল করে নি। রুকুবুড়ির ঘর সাফ করা হয়ে গেলেই, আর সব দায়দায়িত্ব গজাননের হাতে। এমনকি ঘরের তালার চাবিও গজানন নিজের কাছে রাখে, এবং শংকরকে কোনো দিনই ঘরে ঢুকতে অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি।

কি করে যে গজাননের 'সংসার চলে, শংকর ভেবে উঠতে পারে না। শরিকি ভাগাভাগি তো আছেই, তা ছাড়াও নিজেদের ভাইয়ে ভাইয়ে আলাদা। গজাননের মুখেই শুনেছে, তার ভাগে পৌনে চার বিঘা জমি আছে। কিন্তু পরিবারটি তার এ বয়সেই, ছেলেমেয়ে নিয়ে আধ ডজনে দাঁড়িয়েছে। পৌনে বিঘায় একটি গোটা পরিবারের সারা বছর কেমন করে চলে, শংকর ভেবে উঠতে না পারলেও, চোখের সামনেই দেখছে। তাও গজানন বলে, 'মাষ্টারবাবু, মা সিদ্ধেশ্বরীর কী কিরপা গ, ভাগ্যে শালা জমি আমি বর্গা দেই নাই। দিলে, ই বারে ল্যাংটা হয়ে, মাথা চাপড়ে মরত্যে হত্যো। মজুরি দিয়ে চাষ করাই, নিজেও খাটি, তাই রক্ষা।'

শংকর জানে, তা ছাড়াও গজানন বসে থাকার লোক না। হাটে বাটে নানা রকমের কেনাবেচা করে। অবিশ্যি নিজের কোনো ব্যবসা

নেই, পরের হয়ে খাটে। তাতে কিছু জোটে। আর শংকরের কাছ থেকে চার আনা আট আনা পায়, সেটা খরচ হয় বাউরিপাড়াতেই। আধপেটা, এমন কি উপবাসেও চলতে পারে, ঐ দ্রব্যটি না হলে চলে না। শংকর লক্ষ্য করেছে, এটা প্রায় ঘরে ঘরেই চলে। বিশেষ করে, জাতপাত বাদ দিয়ে, দরিদ্রদের মধ্যে মদের ওপর ঝোঁকটা বেশি। এটা কেবল গ্রামে না, শংকর শহরের শিল্পাঞ্চলেও একই চিত্র দেখেছে। হতাশা, অসহায়তা হয়তো এর মূল কারণ। গজাননের ভাষায়, 'ঐ দব্যটি খিদেও মেটায়, উ সব আপনি বুঝতে লারবেন। তবে চোলা মূলার থেক্যে, হাঁড়িয়া ভাল। লংকা পুড়িয়ে নুন মাখিয়ে, এক পাওর খেলে, একটা বেলা পেটে দম থাকে।'

অবিশ্যি গজাননকে পয়সা দেওয়াটাও শংকরের একটা সঙ্কটের বিষয়। কারণ প্রায়ই তার বউ এসে দাবী করে, পয়সাটা গজাননকে না দিয়ে তার হাতে দেওয়াই উচিত। এ উচিত অনুচিতের বিচার করা শংকরের পক্ষে অসম্ভব। মাঝখান থেকে গজাননের বউও একজন দাবীদার হয়ে উঠেছে। ফলাফলটা ভালো হয় নি। কারণ মুখুজ্জে বাড়ীর সকলেরই এমন একটা মনোভাব আছে, শংকরের কাছে হাত পাতলে কিছু পাওয়া যাবে। শংকর সে রকম গৌরীসেনের ভূমিকা নিতে পারে না। অতএব, মুখুজ্জে বাড়ির সকলের কাছে তার সমান কদর নেই।

শংকর গজাননের ওপর থেকে টর্চের আলো সরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কতক্ষণ গজানন?'

'অনেকক্ষণ গ মাষ্টারবাবু।' গজাননের স্বর বেশ জড়ানো, 'একবার থানার দিকে গেইচিলাম, আপনাকে দেখতে পাই নাই। বুইতে পারলাম, আপনি তা'লে চাটুয্যে বাড়ীতে পড়াতে চলে গেইচেন, একেবারে খাওয়া সেরে ফিরবেন।'

'না, আজ আর পড়ানো হয় নি, খেয়েই এসেছি।' শংকর দাওয়ায় উঠলো।

গজানন লণ্ঠনটার সলতে একটু বাড়ালো। কিন্তু অন্ধকার তেমন সরলো না। সে দাঁড়িয়ে লণ্ঠনটা তুলে, শংকরের দিকে আধবোজা

লাল চোখ মেলে বললো, 'আপনার নাকি খুব চোট লেগ্যেছে শুনলাম?'

গজানন বাঁ হাতে লণ্ঠন নিয়ে, ডান হাতে জামার পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলে দিল। সে জানে, শীতের সময় শংকর নিচের ঘরেই শোবে। শংকর টর্চ লাইট জ্বালিয়ে ঘরের মধ্যে ফেললেন। গজানন আগে ঘরে ঢুকলো। মোটা কাঁথার ঢাকনার নিচে জামার পকেট থেকে দেশলাই বের করার শব্দ হলো। কোথায় হ্যারিকেন থাকে, গজাননের তা জানা। সে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে, হ্যারিকেন জ্বালালো। তারপরে শংকরের দিকে তাকালো, বললো, 'ই বাবা, ই যে দেখছি কপালে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা? আর আপনি বলছেন, কিছুই হয় নাই?'

শংকরের সামান্য একটি আলনা, একটি খাটিয়া, একটি স্যুটকেশ আর টিনের তোরঙ্গ, আসবাব বলতে এই আছে। জলের কুঁজো, গেলাস, দুই একটি থালা বাটি গেলাস, চা চিনি মুড়ির কৌটা-বাটা। সে গজাননের কথার কোনো জবাব না দিয়ে, টর্চটা খাটিয়ার ওপর রেখে, গায়ের চাদরটা খুলে আগে আলনায় রাখলো। তারপরে বললো, 'গজানন, আজ আর কথাবার্তা বলতে ভালো লাগছে না, এখন আমি শুয়ে পড়বো। তুমি এখন যাও, কাল কথা হবে।' ৫

গজানন বললো, 'তা হবেক, কিন্তুক বিস্তর কথা শুন্যে এলাম মাষ্টারবাবু। সে সব কথা আমার পেটের মধ্যে গজগজ করছে।'

শংকর জানে, কী কথা। বদির বউকে টাকা পাইয়ে দেওয়া ইত্যাদি বিষয় ছাড়া, আজ আর কোনো কথা থাকতে পারে না। শংকর বললো, 'পেটের গজগজানিটা আজ কোনো রকমে সামলাও, কাল সব দেখা হবে।'

এমন সময় বাইরের দাওয়ায় কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। শংকর মুখ ফিরিয়ে দেখলো, গজাননের স্ত্রী। কিন্তু সে একা না, তার পিছনে গজাননের বড় দাদার একুশ বাইশ বছরের অবিবাহিতা মেয়ে ললিতার মুখও অস্পষ্ট দেখা গেল। গজাননের স্ত্রী চণ্ডীকে নিয়ে শংকরের তেমন দুশ্চিন্তা নেই, কিন্তু ললিতাকে দেখে ও মনে মনে বিরক্ত

হয়ে উঠলো। বললো, 'গজানন, এখন সবাইকে যেতে বলো, আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বো।'

গজানন কিছু বলবার আগেই, চণ্ডীকে পেরিয়ে ললিতা ঘরের ভিতর এক পা বাড়িয়ে দিল, বললো, 'তাড়িয়ে দিচ্ছেন ক্যানে মাস্টারবাবু, একটু দেখে যাই। খবরটা শোনা ইস্তক ছটফট করছিলাম।'

ললিতার কথাবার্তার ধরনই এ রকম। একটা বিদ্রোহের ভাব আছে, এবং কথা তার চোখে মুখে। শংকরের জন্য তার মাথাব্যথাও একটু বেশি, আর সে মাথাব্যথা সে কারোকে লুকিয়ে দেখায় না। আবার বললো, 'বড়লোক চাটুয্যে বাড়িতে সেবাটা না হয় ভালই হঁইচে, আমরা কি একেবারে পর? একটু দেখতেও আসব নাই? কী বলো গো খুড়ি?'

খুড়ি চণ্ডী কেবল বললো, 'দুশ্চিন্তা হয়।'

গজানন বললো, 'ঐ গ ললি, মাস্টারবাবুকে ইবারে শুত্যে দে, কাল যা দেখবার দেখিস।' কিন্তু ললিতার নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না।

শংকর জানে, ললিতা একবার যখন ঘরের ভিতর পা বাড়িয়েছে, সে সহজে নড়বে না। দেখতে সে রূপসী না, কিন্তু কালো রঙের দীর্ঘ শরীরে, স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে একটা ঔদ্ধত্য আছে। চোখ দুটি তেমন বড় না, উজ্জ্বল কালো চোখের তারায় এক রকমের খরতা আছে। সেই খরতা কেবল বিদ্রোহ বিবাদে না, বিদ্রূপে হাসি ঠাট্টায় এবং এমন কি লাস্যেও রীতিমত ঝলক দেয়। চোখা নাক, ঈষৎ পুষ্ট ঠোঁট, সব মিলিয়ে মুখে একটা চটক আছে। সেই চটকের সঙ্গে আছে একটা প্রাখর্য, যা ওর শরীরের ঔদ্ধত্যের সঙ্গে মানিয়ে গিয়েছে। হাসলে খারাপ দেখায় না, রাগলে উগ্রচণ্ডী। এমনিতে সহজে রাগে না। ওর কথাবার্তাই একটু ধারালো। পাড়ার মেয়ে বউয়েরা ওকে সহজে ঘাঁটায় না। কোনো কারণে রেগে গেলে, ললিতা ওর বাবা মা দাদাকেও মানে না। মুখে যা আসে, তা বলে দেয়। তবে বাবা মায়ের ভাষাও, কন্যার সঙ্গে বিবাদের পক্ষে আদৌ ভব্যতার ধার ধারে না। ওর বড় দাদাটির ভাষা আরও খারাপ। নিজের বোনকে

'বাউরি মাগী' বলতে তার মুখে আটকায় না। তবে, ললিতা ছাড়বার পাত্রী না। দাদার মুখে ও রকম গালাগালির জবাবে, হাতে ওর খাঁড়ার বদলে বঁটি ওঠে। শংকর সে-মূর্তি দু-একবার দেখেছে।

দাদার বয়স গজাননের কাছাকাছি। বিয়ে করেছে, এবং ইতিমধ্যেই তিনটি সন্তানের জনক। নিজের বোনকে মুখে কোনো খারাপ কথা বলতে যেমন আটকায় না, তেমনি ভয়ও আছে। ললিতাকে সে মনে প্রাণে ভয় করে। ললিতা যখন বঁটি হাতে এগিয়ে আসে, তখন সে বাড়ি থেকে ছুটে পালায়। শংকর মুখুজ্জে বাড়ির অন্দরমহলে কখনও না ঢুকলেও, এটা বুঝতে পারে, ললিতার বউদি এমনিতে চুপচাপ থাকলেও, যুবতী ননদের বিরুদ্ধে স্বামীকে তাতানোর ব্যাপারে তার হাত আছে।

ললিতার এক দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আরও দুটি দাদা আছে। তাদের সঙ্গে ললিতার তেমন ঝগড়া বিবাদ নেই। কারণটা বোধ হয়, তারা এখনও বিয়ে করেনি। বরং তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ আছে। সেই বিবাদের পিছনে রয়েছে, গ্রামের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক দলাদলি। দুই দাদা দুই দিকে।

সেই হিসাবে বিচার করতে গেলে, মুখুজ্জে বাড়িতে ঝগড়া বিবাদ রোজকার ঘটনা। কখন কোন্ ঘরে, বা কোন শরিকে, কী কারণে ঝগড়া লাগবে, কেউ বলতে পারে না। ঝগড়া বিবাদের সময় তারা নিজেরা চিৎকার করে হাঁকে, 'ই কি বাউরি বাড়ি পাইচিস্, যা মুখে আসবে, তাই বুলবি ?' ·····যতো মন্দ, সবই বাউরিদের। অথচ বাউরিপাড়ায় যারা ঝগড়া বিবাদ করে, তারা গ্রামের মাতালের দল। এ মুখুজ্জে বাড়ির পুরুষরাও তা থেকে বাদ যায় না। সারাদিন বাউরিপাড়ায় একটা লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। সকলেই যে যার কাজে, হাটে বাজারে মাঠে পেটের দায়ে দৌড় ঝাঁপ করে বেড়ায়। সন্ধ্যার পরে তাদের ঘর সংসারের কাজ। শরীরও থাকে অবসাদগ্রস্ত। তবু ঝগড়াঝাটি হয় না, এমন না। তাদের ঝগড়া তাদের মতোই হয়। কিন্তু ভদ্রলোক বলে যারা পরিচয় দেয়, তাদের ঝগড়ার ভাষা বাউরিদের থেকে নিকৃষ্ট। তবুও বাউরিদের তুলনাটা না দিয়ে পারে না।

ললিতার বিবাদের ভাষা সেইরকম নিকৃষ্ট না। কিন্তু হাসি বা রাগের, যে-কোনো কথার ধার বড় বেশি। পাড়ার মেয়ে বউরা সহজে তাকে ঘাঁটায় না, বরং কিছুটা ভয়ে ভক্তিতে মানিয়ে গুনিয়ে চলে। অনেকের সঙ্গে ভাব ভালবাসা, সই মিতেনি চোখের বালি পাতানোও আছে। তথাপি, সবাই সমান না। কখনও কখনও কারো সঙ্গে লেগে গেলে আর রক্ষা নেই। ললিতার প্রতি শংকরের আকর্ষণ, বিকর্ষণ কোনোটাই নেই। কিন্তু পাড়ার কারো সঙ্গে বিবাদের সময় ওর মনে হয়েছে ললিতা পা বাড়িয়ে ঝগড়া করতে যায় না। সাপের ল্যাজে পা দিলে, সাপ যেমন ফোঁস করে ওঠে, ঘটনা ঘটে সেই রকম। কারণটাও বুঝতে অসুবিধা হয় না। ললিতার রূপ না থাক, একটা চটক আর স্বাস্থ্য আছে। নম্রতা তার আচার আচরণে কোথাও নেই, বরং হেসে দাপিয়ে রঙ্গিনী হতে পারে। অতএব, তার দেমাকটাই চোখে পড়ে। যাদের মাথায় একবার বিঁধে গিয়েছে, ললিতা দেমাকী, তাদের সঙ্গে বিবাদ লেগেই আছে।

শংকর আরও অনুমান করতে পারে, ললিতাকে নিয়ে ঘরের বিবাদের কারণটা, ওর বয়স আর পাত্রস্থ না করতে পারার পারিবারিক সংকট ও উদ্বেগ। এর মূল সূত্র দারিদ্র ও অর্থাভাব, কোনো সন্দেহ নেই। একুশ বছর বয়সটাকে এখন আর অরক্ষণীয়া বলা চলে না, কিন্তু শহরে বা গ্রামে, সর্বত্রই বিবাহযোগ্যা মেয়ে, মধ্যবিত্ত পরিবারে চিরকালই গলার কাঁটা। ললিতার এটাও একটা অপরাধ, এখনও কেন ওর বিয়ে হচ্ছে না। এত গরীবের ঘরের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, ললিতার কেন হয় না? অতএব, ললিতার নিজের দুর্ভাগ্যই বেশি দায়ী। এ কথা ওর বাবা মা দাদা, কেউ বলতে কসুর করে না। অথচ এ দুর্ভাগ্যের দায় ললিতা স্বীকার করতে চায় না। ও জানে দায়টা বাবা মা দাদারই।

ললিতা যদি ভীরু শান্তশিষ্ট মেয়ে হতো, তা হলে হয়তো ঘরের কোণে বসে কাঁদতো। নিজের ভাগ্যের জন্য নিজেকে দায়ী করে মৃত্যু কামনা করতো। কিন্তু যে সব কটূক্তি আর অপমানকর কথা ওকে শুনতে হয়, চুপচাপ সে সব হজম করার পাত্রী ও না। মধ্যবিত্তের

দারিদ্র যখন তার চরিত্রকে নিম্নগামী করে, সে যে-কোনো পঙ্কে নামতে পারে। ললিতার প্রতি ওর বাবা মা দাদার কটুক্তির মধ্যে এমন ইঙ্গিতবাচক কথাও থাকে, এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে তার নিজের পথ নিজেই দেখে নেয় না কেন। ইঙ্গিতবাচক কথাগুলোর ভাষা অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত আর ইঙ্গিতবাচক পর্যায়ে থাকে না। অশ্লীল আর কদর্য হয়ে ওঠে। ললিতা বুনো ওলের বাঘা তেঁতুলের মতো সে সব কথার জবাব দেয়।

শংকরের ললিতার প্রতি আকর্ষণ বিকর্ষণ কিছু না থাকলেও, ও যে চুপ করে অপমান সহ্য করে না এতে ওর পূর্ণ সমর্থন আছে। এবং সেই সঙ্গেই, আপাত চোখে মুখরা দজ্জাল মেয়েটির প্রতি একটা করুণা বোধও ওর মনে আছে। হয় তো তা থাকতো না, ললিতার চরিত্রের মধ্যে যদি কোনো মালিন্য বা হীনমন্যতা থাকতো। ও নষ্ট চরিত্রের মেয়ে না, অথচ নষ্ট হবার সুযোগ রয়েছে ওর চারপাশে। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে, ললিতা ঘরে বাইরে এক বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে।

শংকরের একমাত্র অস্বস্তি, ওকে নিয়ে ললিতার মাথা ব্যথা। পারলে, গজাননের দায়িত্বটা ললিতা নিজের হাতেই নিতো। কিন্তু না নিয়েও, ওর ছোট খুড়ো গজাননের ওপর যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। প্রয়োজনে, গজাননের বিশেষ কোনো কাজ পড়ে গেলে, শংকরের ঘরের চাবি ললিতাকে দিয়ে যায়। কারণ নিজের স্ত্রী চণ্ডীর থেকেও, ভাইঝি ললিতার ওপর তার আস্থা বেশি। চাবির জন্য ললিতাকে খুঁজতে যেতে হয় না। গজাননের মতোই সে শংকরের অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু শংকরের অস্বস্তি বাড়ে। সে-কথাটা খুড়ো ভাইঝি কেউ বুঝতে চায় না।

ললিতাকে দায়িত্ব দেওয়া না থাকলেও, রুকু বুড়ির কাজের দেখাশোনাটা ও নিজে থেকেই নিয়েছে। এমনিতেও সকালে বিকালে, ইস্কুলের ছুটির দিনে, অন্যান্য সময়ে, ললিতা শংকরের ঘরের আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। নিজের মুখ ফুটেই সে জানিয়েছে, শংকরের সকালবেলার চা নিজের হাতে তৈরি করে দিতে চায়। শংকর কোনো

দিনই তা দেয়নি। মুখুজ্জে বাড়ির শরিকদের ভয় তো আছেই। তা ছাড়া, নিজের হাতে চা তৈরি করে খেতে সে ভালবাসে। কিন্তু ললিতা ছাড়বার পাত্রী না বলে, 'চা বানাইতে দিবেন নাই ত, আপনার হাতের চা খাওয়াতে হব্যে।'

শংকরের না দিয়ে উপায় থাকে না। তা ছাড়া, প্রায় রোজই ললিতা শংকরের কাছে পয়সা চেয়ে নিয়ে, দেবীর মোড়ের তেলেভাজা দোকান থেকে তেলেভাজা কিনে নিয়ে আসে। শংকরকে দেয়। নিজেও ভাগ বসায়। যেমন ভাগ বসায় চা মুড়িতে। শংকরের সকালের খাবারে, বিলাসিতার মধ্যে ডিমভাজা থাকে। ললিতা তাতে ভাগ বসায় না। শংকর বোঝে, ললিতার চায়ের লোভটা আসল না, একবার না এসে পারে না। ওদের ঘরে চা খাওয়া হয় অনেক সকালে।

শংকর তার অস্বস্তির কথা ললিতাকে বলেছে। ললিতার জবাব, 'ক্যানে, চুরি করে তো আপনার সঙ্গে ভাব জমাতে আসি নাই। আপনার অসোয়াস্তির কী আছে। একটা নিপাট ভাল মানুষের কাছে আসতে ইচ্ছা করে, তাই আসি। লোকে যা খুশি তা বলুক, উয়াতে আমার কিছু যায় আসে না।'

শংকর ললিতার সঙ্গে কথায় পারে না। হাল ছেড়ে দিয়েছে। যথাসম্ভব নির্বিকার থাকলেও ললিতা ওর নিজের মতোই যাওয়া আসা করে। তবে, সময় কম, এবং দিনের বেলাতেই যা একটু যাতায়াত করে। রাত্রে কখনো আসে না। আজকের ঘটনাটা অবিশ্যি আলাদা। গজাননের স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে, বোধ হয় আগে থাকতেই আসবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। ললিতার কথাবার্তার মধ্যে এমনিতে কোনো তিক্ততা নেই। কিন্তু চাটুয্যে বাড়ির সম্পর্কে, শংকরকে খোঁচা না দিয়ে পারে না। শংকরের কাছে এখন সেটা, গা সওয়া হয়ে গিয়েছে।

গজাননের কথা শুনেও, ললিতা ঘরের মধ্যে ঢুকে বললো, 'মাস্টারবাবুকে জেগ্যে বসে থাকত্যে হবে নাই, ই ত আর বাসর ঘর লয় ওঁকে শুত্যে দিব নাই? একটা মন্দ কথা শুনলাম, সবাই বলা

কওয়া করছে, আমাদের বাড়ি মানুষটা থাকে, একটা খবর লিব নাই ? কী বল গ ছোট খুড়ি ?'

গজাননের স্ত্রী চণ্ডী বললো, 'নিজেদের লোকের মন্দ খবর শুনল্যে, মন ঠিক রাখা যায় নাই।'

শংকর বললো, 'তা বেশ তো, খবর যা পাবার তা তো আগেই পেয়েছ। এখন আর কী দরকার ?'

'মাষ্টারবাবু আমাদের উপর রেগ্যেই আছে।' ললিতা বললো, 'একটা খবর লিতে এল্যে কি তাড়িয়ে দিতে হয় ? আমাদের কি জানতে ইচ্ছা করে নাই ?' বলে একবার পিছনে চণ্ডীর দিকে দেখে নিয়ে আবার বললো, 'তায় আবার যখন কানে এল্য, গাড়িঅলা লোকটা নাকি মাষ্টারবাবুর বন্ধুর ভাই, কলকাতার চেনা মানুষ। সে কি কর্যে মাষ্টারবাবুকে ধর্যে মারল্যে ?'

শংকর একটা সিগারেট ধরিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললো, 'কী করে জানলে, আমাকে সে মেরেছে ?'

'ক্যানে, খবর শুনে আমি চণ্ডীতলার মোড়ে গেইচিলাম নাই ?' ললিতা শংকরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'চায়ের দোকানি দুলাল নিজে আমাকে বুলল্যে, গাড়িঅলাটা গাড়ির দরজার ধাক্কা দিয়ে আপনাকে মের্যেছে। আপনার গাল কপাল মাথা কাটিয়ে দিইচে।'

শংকর জানলো, দুলাল ঘটনাটা ঠিকই দেখেছে, ললিতাও মিথ্যা শোনে নি। কপালের আর গালের সঙ্গে মাথাটাও জুড়ে দিয়েছে। শংকর বললো, 'তা দিয়েছে। তখন আমার বন্ধুর ভাই আমাকে চিনতে পারে নি। আর আমি তখন না আটকালে, লোকটা পালিয়ে যেত।'

'তা বুল্যে আপনি নিজের জীবনটা খোয়াইত্যে গেইচেলেন ?' ললিতার স্বরে উদ্বেগ, 'লোকটা যদি আপনাকে মেরে ফেলত্য ?'

চণ্ডী বলে উঠলো, 'কী সব্বনেশে কথা গ বাবা !'

শংকর বললো, 'মেরে ফ্যালা কি এতো সহজ ? তবে হ্যাঁ, বদির ছেলেটাকে আমি বাঁচাতে পারলাম না।'

'আর সেই লোককে কী না আপনি পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে

দিলেন ?' ললিতার খর চোখের তারা দুটো বড়ো হয়ে উঠলো।

গজানন বললো, 'আর বুল্যে কী, জানচিস রে ললি, মাষ্টারবাবু নিকি গাড়িঅলার কাছ থেক্যে টাকা খেয়্যেচে।'

'উ কথা আমি মরে গেইল্যেও বিশ্বাস করব নাই ছোট খুড়ো।' ললিতা ওর স্বভাবসিদ্ধ ঝাঁজালো গলায় বললো, 'যারা রটাইচে, উ ডেঙরগুলানকে আমি চিনি। কিন্তু আমি অবাক হই, মাষ্টারবাবু উ গাড়িঅলাকে বাঁচাত্যে গেলেন ক্যানে ? শুনলাম নাকি উয়ার সঙ্গে দুই রোপসী মেয়ে ছিল !' ললিতার চোখে সন্দেহের ছায়া।

শংকর হাসলো। যার যেমন মন, সে সে-দিকটাই আগে ভাবে। ললিতার ধারণা রূপসীদের মুখ দেখে, সে অপরাধীকে ছেড়ে দিয়েছে। ও বললো, 'যারা ছিল তারা রূপসী কী না, ভালো করে তাকিয়ে দেখি নি। তবে পুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা আমি করি নি। তুমি ঐ ডেঙর না কী বললে, তারাই করেছে। আমি তখন থানায় ছিলাম না।'

'অই, শুনচ্য গ ছোট খুড়ো ?' ললিতার চোখ দপদপিয়ে উঠলো, 'আর হাড়-হাভাতে শয়তানগুলান মাষ্টারবাবুর নামে কী সব রটাইচ্যে।'

গজাননের হঠাৎ বীরত্ব জেগে উঠলো, সে চিৎকার করে বললো, 'উ শালারা আমার সামনে কিছু বুলত্যে এল্যে উয়াদের জিভ ছিঁড়ে লিব।'

শংকর হেসে বললো, 'ওদের জিব ছেঁড়া এত সহজ নয় গজানন, তা তুমি ভালোই জানো। বেশি কিছু বলতে গেলে, ওরাই তোমার জিব ছিঁড়ে নেবে। তুমি ও সব কথার মধ্যে থাকতে যেও না।'

চণ্ডী মুখ ঝামটা দিল, 'হুঁ, তুমি সব করবে। চুপ কর দি'নি ?'

ললিতা শংকরের দিকে দু' পা এগিয়ে উৎকণ্ঠিত স্বরে বললো, 'কিন্তু এই যে মুখ মাথা ফাটিয়ে এলেন, এখন কী হবে ?'

'কী আবার হবে।' শংকর হেসে বললো, 'হাসপাতালের ডাক্তার সেলাই করে ওষুধ-বিষুধ দিয়ে দিয়েছে। বেশি জ্বালা যন্ত্রণা হলে বা জ্বর-টর এলে, দু-একদিন ইস্কুলে যাওয়া হবে না, এই যা মুশকিল।'

ললিতা বললো, 'মুশকিলের আবার কী আছে? দুটো দিন ঘরে শুয়্যে থাকবেন। এমনও লয় দেখবার কেউ নাই। তবে হুঁ, ইয়ার মধ্যে একটা কথা আছে। আপনি অসুখ হয়্যে ঘরে শুয়্যে আছেন শুনলে, চাটুয্যে বাড়ির মোটরগাড়ি এসে আপনাকে উয়াদের ঘরে লিয়ে যাবে।'

'কেন, এ রকম কখনো দেখেছো নাকি, আমার শরীর খারাপ হলে, বা ছুটিতে ঘরে থাকলে, চাটুয্যেদের গাড়ি এসে আমাকে তাদের ঘরে নিয়ে যায়?' শংকর হেসে বললো।

ললিতা বললো, 'এ যাবত দেখি নাই, তবে উয়াদের সেবা আপনার ভাল লাগে, লিয়ে গেলেই বা কে কি বুলত্যে পারে?'

এ বিষয়ে ললিতাকে বুঝিয়ে বলে কোনো লাভ নেই। চাটুয্যে বাড়ি সম্পর্কে বরাবরই ওর একটা বিরোধী মনোভাব আছে। সেটা কতোখানি গরীব বড়লোকের কারণে, তা আজও স্পষ্ট করে বোঝা যায় নি। এমন কি, মল্লিকা যে তার পুরনো পরিচিতা কলকাতার মেয়ে, ললিতা তা জানে না। জানলে চাটুয্যে বাড়ির ক্ষেত্রে, শংকরের সম্পর্ককে সে অনিবার্য ভাবেই একটা অন্য রূপ দিতো। সে-রূপটা মোটেই সুরূপ হতো না, বরং একটা কলংকের বোঝা চাপিয়ে দিতো। এমনিতেই শংকর অনুমান করতে পারে, চাটুয্যেরা বড়লোক বলে, ললিতার তেমন মাথা ব্যথা নেই। ওর আসল মাথা ব্যথা, মল্লিকা আর আরতি। ওর কথাবার্তায় ধরনেই অনেকবার বুঝিয়ে দিয়েছে, চাটুয্যেদের ন' আর সেজ বউয়ের সেবাটাই শংকরের আসল আকর্ষণ।

শংকর তর্ক করে না, হাসে। ললিতার সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়া, বিষয়টিকে আরও মূল্য দেওয়া। এমনিতেই ললিতা নিজের মতো যুক্তি সৃষ্টি করতে অদ্বিতীয়া। বোবার শত্রু নেই, এ যুক্তি ললিতার কাছে খাটে না। সে বোবাকেও কথা বলাতে পারে।

শংকর হেসে বললো, 'গরীব মাস্টার আমি, একটা বাড়িতে পড়িয়ে একবেলা খাই। এতে সেবার কথা কেন আসে জানি নে। তুমি যদি অন্যত্র একটা ব্যবস্থা দেখে দাও, সেখানেই না হয় পড়িয়ে এক বেলা

খাবো। অন্য এক বাড়িতে পড়িয়েও তো এক বেলা খাই।'

'তবু চাটুয্যে বাড়ি বলে কথা!' ললিতা ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখের তারা ঘোরালো, 'শালচিতির জমিদার বাড়ির অন্দরমহলের সেবা, সে কি সবাই দিতে পারে?'

শংকর দুর্বল হেসে বললো, 'ললিতা তোমার কাছে তো আমি বরাবর হার মেনেই আছি। শরীরটা সত্যি ভালো লাগছে না, এবার আমাকে শুতে দাও।'

'হঁ, শুয়্যে পড়েন।' ললিতার মুখ গম্ভীর, বিষন্ন চোখ শংকরের মুখের দিকে, 'ই সব কথা বুলতে আসি নাই, আপনাকে দেখতে আইচিলাম। খবরটা শোনা ইস্তক মনটা বড় আনচান করচিল। ভাল মানুষের মন্দ করতে অনেকে আছে, দেখি ত। এখন ভগবান করুন, জ্বর যাতনা যেন না হয়।' সে পিছন ফিরে ঘরের বাইরে চলে গেল।

গজানন বললো, 'হঁ, শুয়্যে পড়েন মাষ্টারবাবু। দরজাটা বন্ধ করেন। চল ছোট বউ।'

চণ্ডী ললিতার সঙ্গেই বোধ হয় গিয়েছিল, গজাননের সেটা খেয়াল নেই। সে মাটির দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে তালা চাবি রেখে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শংকর একলা ঘরে, সিগারেট টানতে টানতে, এই মুহূর্তে ললিতার কথা ভাবলো। মেয়েটা খারাপ না। কিন্তু ঘরে বাইরে কোথাও নিরাপত্তা নেই। এই অসহায়তা ওকে এক রকমের দুর্দমনীয় করে তুলেছে। ভালো ঘর বর সংসার পেলে, এই ললিতাই সকলের প্রশংসার পাত্রী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সংসারে কে কবে নিজের যথার্থ স্থান খুঁজে পেয়েছে। কোটিকে গোটিক, চোখে পড়ে না। ললিতার একটা সদগতি হলে, শংকর সুখী হবে।

শংকর সাধারণত সুর্যোদয়ের আগেই বিছানা ছেড়ে ওঠে। পরের দিন ঘুম ভেঙ্গে, চোখ মেলে তাকিয়ে মনে হলো, ঘরে আলোর ছড়াছড়ি। গায়ের কম্বলটা সরিয়ে, ধড়মড় করে উঠতে গিয়েই, কপালের আর গালের ব্যথাটা রীতিমতো টনটনিয়ে উঠলো। তা

ছাড়া, মনে হলো, সারা গায়েই কেমন একটা ব্যথা। ও মাটির দেওয়ালের গায়ে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো, বাইরে রোদ দেখে, ও আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু খাটিয়ার বিছানা থেকে নামতে গিয়ে অনুভব করলো, সারা গায়ে হাতে পায়ে কেবল ব্যথা না, শরীরটা দুর্বলও লাগছে। এবং, শীতটাও যেন অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু বেশি লাগেছে।

গতকাল রাত্রে আর ধুতি খোলা হয় নি। গায়ের রক্ত লাগা জামাটা খুলে, গেঞ্জি গায়ে দিয়ে শুয়েছিল। কিন্তু শীতটা বেশি অনুভূত হওয়ায়, খাটিয়া থেকে আস্তে আস্তে নেমে, ও আগে আলনা থেকে ঘরে গায়ে দেবার চাদরটা জড়িয়ে নিল। কুলুঙ্গির কাছে রাখা ছোট আয়নায় একবার মুখটা দেখলো। মুখটা কি ফুলেছে? বুঝতে পারলো না। কিন্তু চোখের নীচের কোণ দুটো কেমন ফোলা দেখাচ্ছে। মুখে একদিনের দাড়ি গোঁফে, একটা কালো ছাপ পড়েছে। মাথার সামনের চুল এসে পড়েছে কপালের ওপর বাঁধা ব্যাণ্ডেজের ওপর।

শংকর ব্যাণ্ডেজের ওপর থেকে আস্তে আস্তে চুলগুলো সরিয়ে, দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজাটা খুললো। প্রথমেই চোখে পড়লো, রুকু বুড়ির ইতিমধ্যেই দাওয়া ও নীচের সামান্য উঠোনটি নিকানো হয়ে গিয়েছে। নিকানো দাওয়ার ওপর বসে আছে চাটুয্যে বাড়ির বিশ্বস্ত পুরনো লোক হরি। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই, খড়ের ঠাকুর দালানের উঠোনে ললিতাকে দেখা গেল। সে রুকু বুড়ির সঙ্গে কোনো কথা বলছে, কিন্তু দৃষ্টি এদিকে।

হরি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'সেজবাবু পাঠাই দিল্যেন, কেমন আছেন, দেখতে।'

'খুব ভালো বুঝিনে।' শংকর বললো, 'তুমি কখন এসেছো?'

হরি বললো, 'তা এঁজ্ঞে অনেকক্ষণ হবেক বটে, রোদ উঠবার আগে আইচি। ত দেখলাম, আপনি ঘুমাইচেন, আর ডাকা করি নাই।'

'ডাকলেই পারতে।' শংকর বললো, 'যাই হোক, তুমি বাড়ীতে

গিয়ে বল, শরীরটা তেমন সুবিধের নেই, আজকের দিনটা ভাবছি বিশ্রাম নেবো। কিন্তু কেউ যেন ব্যস্ত না হন।'

হরি বলল, 'আমি যেইয়ে খবর দিয়া করচি। ইয়ার পরে বাবু মায়েরা বুঝবেন, কী করবেন। আমি এখন যাই।'

'হ্যাঁ এসো।'

হরি ঠাকুর দালানের উঠোনের দিকে এগিয়ে গেল। শংকর ঘরে ঢোকবার আগেই দেখলো, রুকু বুড়ির আগে আগে ললিতা এগিয়ে আসছে। সে ফিরে না তাকিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

মুখ ফিরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই, শংকরের মনে হলো, মাথাটা যেন ঘুরে গেল। এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে দাঁড়ালো। না, যতোখানি ভেবেছিল, ততোটা কিছু না। মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মতো অবস্থা হয় নি। আসলে শরীরটা দুর্বল লাগছে। খাটিয়ার বিছানা থেকে উঠতে গিয়েই এ দুর্বলতা অনুভব করেছিল। কিন্তু শীতটা যেন একটু বেশিই লাগছে। থেকে থেকে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। গায়ে একটা ব্যথাও রয়েছে। কপাল আর গালের ব্যথাটা যেন গতকালের তুলনায় কিঞ্চিৎ বেশি অনুভূত হচ্ছে।

কিন্তু শংকর দাঁড়ালো না। ঘরের এক পাশে, ছোট এক মাটির মালসায়, ভেজা ন্যাকড়ায় জড়ানো নিমকাটির দাঁতন রয়েছে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে, নিমকাটি চিবিয়ে দাঁত মাজাটাই ওর প্রথম কাজ। নিমের ডাল কেটে এনে, মালসার মধ্যে ভেজা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে রাখাটা গজাননের কাজ। অথচ, কলকাতার একদা অতীত জীবনটাকে যদি গতজন্ম বলা যায়, সেই সময় বাসি মুখ ধোবার আগেই প্রাণটা চা চা করতো। এখনও করে, তবে বাসি মুখে না। দাঁত মেজে মুখ না ধুয়ে, চা মুখে তোলবার কথা এখন যেন ভাবতেই পারে না। আগে কি করে বাসি মুখে চা খেতো, সে-কথা ভাবলে অবাক লাগে।

শংকরের প্রাত্যহিকতার মধ্যে, ভোরবেলা ঘুম ভেঙে এই ভাবেই শুরু হয়। নিমডালের দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতেই, জনতা স্টোভ ধরিয়ে, ছোট কেতলিতে চায়ের জল বসায়। জামরুল গাছের

দিকে, দাওয়ার ওপরে রুকু বুড়ি বালতিতে মুখ ধোয়ার জল রেখে দেয়। শংকর মুখ ধুয়ে এসে, চা তৈরি করে। জনতা স্টোভ জ্বালানো নির্ভর করে কেরোসিন তেলের ওপর। অবিশ্যি সারাদিনে একবার মাত্র স্টোভ জ্বালাতে হয়। চায়ের জল ফোটাবার জন্য। তুলনায় রাত্রের দিকে হ্যারিকেন জ্বলে কিছু বেশি সময়ের জন্য। ঘুমোবার আগে, দুপুরে পৌঁছানো কলকাতার দুটো খবরের কাগজ, ইংরেজি আর বাংলা, আর একবার পড়ে। সারাদিন সময় বিশেষ পাওয়া যায় না। খবরের কাগজ দুটো ইস্কুলে পৌঁছায়। তখন অন্যান্য শিক্ষক সহকর্মীরা কাগজ দুটো নিয়ে টানাটানি করে। খবরের কাগজ ছাড়াও থাকে কিছু বই। সে সব বই প্রধানতঃ দেশী বিদেশী সমাজতত্ত্বমূলক। ইতিহাসও ওর প্রিয় বিষয়। প্রাচীন এবং আধুনিক, দুই-ই। সমাজতত্ত্বের সঙ্গে ইতিহাসের যোগাযোগ দৃষ্টিকে অনেকখানি দূরগামী করতে সক্ষম হয়। অবিশ্যি সাহিত্যও ওর প্রিয় বিষয়। 'যাহা পাই তাহা খাই' গোছের গোগ্রাসী পাঠক না। এক সময়ে ইংরেজি সাহিত্য ছাড়া পড়তো না। এখনও সে-অভ্যাসটা একেবারে ত্যাগ করতে পারে নি। কিন্তু আজকাল বাংলা বইও ওর পাঠ্য তালিকার সংখ্যা অনেক বাড়িয়েছে।

সকালে একবার স্টোভ জ্বালিয়ে চা, রাত্রে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে ঘণ্টা দেড় দুই পড়া, সব মিলিয়ে কেরোসিনের খরচা এইটুকুই। ওর নিজের চলে যায়। পয়সার জন্য আটকায় না। মাঝে মাঝে গোটা অঞ্চলে কেরোসিনের অভাব দেখা দেয়। তখন শংকরকেও অভাবে পড়তে হয়। সেটা কালে-ভদ্রে। সবাই জানে, কেরোসিনের অভাব নেই। অভাব পয়সার। শালচিতির কোন্ ব্যবসায়ীর ঘরে কী আছে, গজাননের নখদর্পণে। টাকা পেলেই সে সব কিছু যোগাড় করে আনতে পারে। তবু শংকর একটা কাঠের তোলা উনুনের ব্যবস্থা রেখেছে। সবই অবিশ্যি গজানন আর রুকু বুড়ির ব্যবস্থা। ছোট ছোট আঁটি বেঁধে কাঠ-কুঠোও রাখা আছে। মোমবাতিও কেনা আছে। কাজ চলবার মতো সব ব্যবস্থাই মজুদ।

শংকর ঘরের একপাশে রাখা মালসার থেকে, ভেজা কাপড়ে

ভিজানো নিমকাটির দাঁতন তুলে নিল। দাঁত মেজে, চা খেয়ে, সিগারেট ধরিয়ে, গামছা জামাকাপড় নিয়ে গ্রামের ভিতরের রাস্তা দিয়ে চলে যায় চিতি নদীর ধারে। যাতায়াতের পথে এর ওর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা, গ্রামের খবরাখবর লেনদেন চলে। ফিরে এসেই, ছাত্র পড়াতে যেতে হয়। ছাত্র পড়িয়ে, সেখানেই খেয়ে নিয়ে, সোজা ইস্কুলে চলে যায়। কিন্তু আজ সেই প্রাত্যহিকতায়, গোড়া থেকেই গোলমাল। শরীরটা কতোখানি খারাপ হয়েছে, বোঝাবার আগেই, মুখের ভিতর নিমের ডাল ঢুকিয়ে, কষের দাঁতে চিবোতে গিয়েই, গালের ক্ষতে ব্যথায় টনটনিয়ে উঠলো। বিকৃত হয়ে উঠলো মুখটা।

'কী হল্য গ মাস্টারবাবু?' দরজার সামনে থেকেই ললিতার উৎকণ্ঠিত স্বর শোনা গেল, 'দাঁত ব্যথা হইচে কি?' বলতে বলতে সে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো।

শংকর মুখের ভিতর থেকে নিমের ডাল বের করে, গালের ব্যাণ্ডেজের ওপর হাত রাখলো। বললো, 'না, দাঁতে ব্যথা হয়নি। দাঁতন চিবোতে গিয়ে দেখছি, গালে লাগছে।' ও নিমের দাঁতনটা চোখের সামনে তুলে দেখলো। হেসে বললো, 'দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজা চলবে না দেখছি।'

'কিন্তু মাস্টারবাবু, আপনার মুখখানা ফুল্যে উঠেচে, চোখ দুটা ভিতরে ঢুকে গেইচে।' ললিতা একেবারে শংকরের সামনে এসে দাঁড়ালো, এবং অসংকোচে চিবুকের নিচে গলায় হাত স্পর্শ করে বলে উঠলো, 'অই, যা ভেবেচি, গা বেশ গরম, জ্বর হইচে।'

শংকর দরজার কাছে গিয়ে, নিম দাঁতনটা বাইরে ছুড়ে ফেলে দিল। রুকু বুড়ি দাওয়ায় উঠে এলো। এখন খাটিয়ার বিছানা গুটিয়ে, ঘর ঝাটপাট দিয়ে গোছাবে। সেও নিশ্চয় শংকরের ঘুম ভাঙবার, ও দরজা খোলার অপেক্ষায় ছিল। শংকর বললো, 'এসো রুকুদিদি। আমার জন্যে আজ তোমার দেরি হয়ে গেল।'

'তা হক ক্যানে, আমার ত দশ বাড়িতে কাজ করার নাই।' রুকু বুড়ির দুই চোখে উদ্বেগ ও বিস্ময়, 'কাল রাত্তিরেই শুন্যেচি, বদির বিটা গাড়ি চাপা পড়ে মরেচ্যে, তুমারও খোয়ার হইবে। কিন্তু তুমাকে

এত মার মেরেচ্যে, গোটা মুখে কাপড় বান্দা !'

শংকর ঘরের মধ্যে সরে আসতে আসতে বললো, 'কপালের লিখন রুকুদিদি। তুমি তোমার কাজ কর, আমি স্টোভ জ্বালিয়ে জল গরম করি।'

'তার আগে আমি বালতিতে করে টেপা কল থেক্যে জল লিয়ে আসি।' রুকু বুড়ি দাওয়ার অন্য দিকে যেতে যেতে আপন মনেই বকবক করতে লাগলো, 'ভাল মান্‌ষের ই কি খোয়ার বাবা! দোষ ধান্দা কিছু নাই, মানুষটাকে পিটাই করল্যে। ভগমানের কি বিচার, বুইতে পারি না।'···

রুকু বুড়ি রোজ আগে জল আনে। শংকর চা খেয়ে, চিতির ধারে বেরিয়ে যাবার পরে সে ঘর দরজা বন্ধ করে গোছায়। শংকর খাটিয়ার বিছানার বালিশের পাশে রাখা দেশলাইটা নিয়ে স্টোভের কাছে এগিয়ে গেল। ললিতা আচমকা শংকরের হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে বললো, 'ই কাজটি আজ আপনাকে করাতে হবে নাই। আপনি খাটে বসেনগা, আমি চায়ের জল চাপাই দিচ্ছি। যেমনটি বুলবেন, তেমনটি করব। গায়ে জ্বর জ্বালা ব্যথা লিয়ে আজও নিজের হাতে সব করতে হবে ক্যানে?'

শংকর অস্বস্তি বোধ করলো, বললো, 'আমার কোনো কষ্ট হতো না।'

'জানি' ললিতা স্টোভের সামনে বসে, পল্‌তে বাড়িয়ে তুললো, 'আপনি সব পারেন। কিন্তু গায়ে জ্বর নিয়ে আপনি চা করে খাবেন, কাছে দাঁড়িয়ে উটি দেখতে পারব নাই। জল কতক্ষণ ফুট খেল্যে, কত্‌টুনি চা দিব, বলে দেন, সেরকমটি করে দিব। তবে, আপনার চা করা আমার জানা হয়্যা গেইচে, না বুলে দিলেও পারব।'

ললিতার কাছে থাকাটাই আসল কথা। কাছে দাঁড়িয়ে না দেখতে হলে, কোনো কথা ছিল না। কিন্তু রোজ সকালেই শংকরের চায়ের ভাগীদার হিসাবে ললিতা উপস্থিত থাকে। অতএব কাছে সে থাকতোই। বিশেষ করে গতকাল রাত্রের ঘটনার পরে আজ ললিতা বোধ হয় অন্যান্য দিনের তুলনায় আরও সকালে এসে হাজির হয়েছে।

শংকর জানে, গতকাল রাত্রে, ললিতা উদ্বেগ নিয়ে ফিরে গিয়েছিল। ও যতোই এ জেদী মেয়েটিকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করুক, তাতে কিছু যায় আসে না। একুশ বছরের অবিবাহিতা মেয়েকে এ যুগে, সাবেক কালের অরক্ষণীয়া না ভাবলেও, গ্রামীণ সমাজ জীবনের একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে অবিবাহিত যুবক শংকরের ঘরে ললিতার যাতায়াতটা অনেকখানি নীতিবিগর্হিত।

কিন্তু শংকর ললিতাকে কোনো দিনই যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েও নিরস্ত করতে পারেনি। ললিতার এ ঘরে আসা, শংকরকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা উদ্বেগ, সবই ওর নিজস্ব ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে কারোর কোনো বাধাকেই ললিতা মেনে নেয় নি। অবিশ্যি ওর বাবা দাদা খুড়ো, কেউ কোনোদিন বাধা দেয়ও নি। শংকরের মুখে অস্বস্তি ফুটলো। নিরুপায় হয়ে, গম্ভীর মুখে খাটিয়ায় গিয়ে বসলো। বললো, 'তোমাকে বললেও যখন শুনবে না, তখন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।'

'জানেন ত কথা বাড়াইচেন ক্যানে?' ললিতা ওর স্খলিত বাসি খোঁপায় ঝাপটা দিয়ে, পিছন ফিরে শংকরের দিকে তাকিয়ে হাসলো, 'আগে কোন দিন কি আপনার ইস্টোভ ধরাইচি, না চা বানাইচি? রোজ আপনার হাতের চা খেয়্যে যাই, আজ অসুখ শরীরে আমার হাতে খান।'

শংকর বললো, 'কিন্তু স্টোভটা ধরাবার আগে, এক কেতলি জল বসাও। গরম জলে মুখ ধুয়ে, তারপরে চা খাবো। মুশকিল হলো, দাঁত মাজা। কোনো মাজন-টাজনও ঘরে নেই যে, দাঁত মাজবো।'

'গুড়াকু দিয়ে দাঁত মাজবেন কি?' ললিতা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'বলেন ত গুড়াকু ঘর থেক্যে লিয়ে আসি।'

শংকর জানে, এখানে বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ, প্রায় সকলেই গুড়াকু ব্যবহার করে। সেটা কেবল দাঁত মাজার কারণে না, কিঞ্চিৎ নেশার ব্যাপারও আছে। বস্তুটির মধ্যে তামাকের মিশেল আছে। এ নেশা এসব অঞ্চলের গ্রামে এমন ব্যাপক, কেবল মাঠে ঘাটে কাজ করা অল্পবয়সী বালকেরাই এর শিকার না, ইস্কুলে অনেক ছেলেও পকেটে গুড়াকুর কৌটা নিয়ে যায়। দশ বারো বছরের ছেলেও বাদ যায় না।

বাধা দিয়ে, শাসন করে থামানোও মুশকিল। অনেক শিক্ষকরাও গুড়াকু ব্যবহার করেন। উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের গুড়াকু লেনদেন, শংকর নিজের চোখেই দেখেছে। আসলে, এটাও গ্রাম-সমাজের নীতিবোধের ওপর নির্ভর করে। গুড়াকু ব্যবহার করা কারোর কাছেই নিষিদ্ধ না। এবং নেশার বস্তু বলে স্বীকৃত না। অথচ, ব্যবহারকারী বালক বৃদ্ধ, সকলের কাছেই গুড়াকু অপ্রতিরোধ্য বস্তু। শংকর জানে, ললিতা গুড়াকু ব্যবহার করে না, কিন্তু ওদের বাড়ির মেয়ে পুরুষ প্রায় সকলেই ব্যবহার করে। বস্তুটির স্বাদ শংকরের জানা আছে, অরুচি তীব্র। বললো, 'না, তোমাকে আর গুড়াকু আনতে হবে না। জলটা গরম করে দাও, তা দিয়েই আমি মুখ ধুয়ে নেবো।'

'আহ, মাষ্টারবাবু, তবে এক কাজ করেন, লুন দিয়া দাঁত ঘষেন।' ললিতার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'উয়াতে দাঁত মাজা হবো, জ্বরের মুখে রস লাগবে।'

রস সম্ভবতঃ মুখের স্বাদের রুচির কথা। শংকরেরও কথাটা মনে ধরলো। বললো, 'এটা একটা কাজের কথা বলেছ।' বলে সে খাটিয়া থেকে নামতে উদ্যত হলো।

'বসেন না ক্যানে, আমি দিচ্ছি।' ললিতা নীচু হয়ে কাঠের মুখ ঢাকা চেনা বাটি থেকে খানিকটা নুন নিয়ে, শংকরের কাছে এগিয়ে গেল, 'হাত পাতুন।'

শংকর বাঁ হাত পেতে নুন নিল। ললিতা সরে গিয়ে, ধোয়া কেতলি হাতে তুলে নিল। ঘরের এক কোণে রাখা কুজো থেকে, কেতলিতে জল গড়িয়ে ভরলো। স্টোভের কাছে এসে বসে, দেশলাই জ্বালিয়ে, তোলা পল্‌তে ধরালো। দেখতে দেখতেই আগুনের শিখা নীলচে হয়ে উঠলো। ললিতা কেতলিটা চাপিয়ে দিল।

শংকরের পক্ষে বসে থাকা সম্ভব হলো না। নুন দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে ও বাইরের দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়ালো।

শংকরকে হঠাৎ বাইরে চলে যেতে দেখে, ললিতার ভ্রূকুটি চোখে

'উৎকণ্ঠা ফুটলো। সেও স্টোভের কাছ থেকে উঠে, বাইরের রকে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হল্য, মাস্টারবাবু, বমি পাইচে নাকি?'

শংকর বাঁ হাত তুলে নাড়লো। রকের শেষ প্রান্তে, যেখানে মুখ ধোয়, সেখানে গিয়ে থুথু ফেলে বললো, বমি পাবে কেন? মুখে নুন দিতেই, ভেতরটা লালায় ভরে উঠেছিল।'

'তাই ভাল।' ললিতা হাসলো, 'আমি ভাবি কি লুন মুখে দিয়ে, বমি পাইচে বা। অভ্যাস ত নাই।'

শংকর দাঁত মাজতে মাজতে আর একবার থুথু ফেলে বললো, 'তুমি জলটা দেখ, বেশি গরম করো না। আমি গরম জলে মুখ ধুযে নেবো।'

'তা ক্যানে? আপনাকে আমি ফুটন্ত টগবগে জল দেব মুখ ধোবার লেগ্যে।'

ললিতার মুখে হাসি লেগেই ছিল, 'আমি কি উ সব বুঝি সুঝি?' বলে ঘরের দিকে পা বাড়িযে বললো, 'তবে মনে রাখবেন, হাত বাড়িযে আমার হাত থেক্যে লুন,লিযেচেন, একটু গুণ গাইবেন '

শংকর রকের শেষ প্রান্ত থেকে ফিরে তাকালো। ললিতা তখন ঘরের মধ্যে ঢুকে গিযেছে। ও নিজের মনে একটু অপ্রস্তুত হাসলো। ভুলে যায়, ললিতার বোধ বুদ্ধি কিছু কম নেই। মুখ ধোযার জল কতোটা গরম করা উচিত, সে কথা ওকে বলার দরকাব ছিল না। সংসার বা ঘরকন্নায় অভিজ্ঞতা ওর কম না। কিন্তু যথাযোগ্য স্থানে সেগুলো কাজে লাগাবার উপায় নেই। অপরাধ তো ওর একটাই। বয়স হয়ে যাচ্ছে, অথচ বাবা দাদার ক্ষমতা অনুযায়ী একটা পাত্র যোগাড করা যাচ্ছে না।

শংকরের ভাবনার মধ্যেই, এলুমিনিয়ামের একমাত্র বড় মগে মুখ ধোবার জল নিয়ে ললিতা এগিয়ে এলো, 'ছাখেন, ইয়াতে হবে কী না। কুসুম কুসুম থেক্যে একটু বেশি গবম করেচি। এই ঠাণ্ডা আর জ্বরের মুখে ই রকমটি সইবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে দাও।' শংকর হাত বাড়িয়ে মগটা নিয়ে, রকের ওপর উপুড় হয়ে বসলো।

ললিতা বললো, 'মুখে সাবান মাখবেন কি? দাড়ি ত কামাতে পারবেন নাই। মুখে সাবান মাখবেনই বা কুথায়? কাঁচা ঘা, ভিজে গেলো আউড়ে উঠবে না?'

ললিতার একটি কথাও মিথ্যা বা ভুল না। ডাক্তার সুজিতও বলে দিয়েছিল, অন্ততঃ তিন দিন যেন ক্ষতে জল না লাগানো হয়। তাহলে সেপটিক হয়ে যেতে পারে। ললিতার ভাষায় সেপটিকই বোধ হয় আউড়ে ওঠা। তাছাড়া শংকর প্রতি দিন সকালবেলা দাঁত মেজে সাবান দিয়ে মুখ ধোয়া, চা খেয়ে দাড়ি কামিয়ে, চিতির ধারে যায়, ললিতার সে-খেয়ালও আছে। স্বাভাবিক, কারণ শংকরের প্রতিদিনের সকালের শুরুটা, ওর চোখের সামনেই ঘটে। শংকর বললো, 'না, আজ আর সাবান মুখে লাগাবার উপায় নেই, দাড়িও কামাবো না। মুখ ধুয়ে একটু গরম চা আর মুড়ি খাবো। তারপরে ওষুধ খেতে হবে।'

'চায়ের জল বসিয়ে দিইচি।' ললিতা ঘরের দিকে পা বাড়ালে।

শংকর মুখে জল দেবার উদ্যোগ করে বললো, 'রুকুদির জন্যও চায়ের জল নিয় কিন্তু।'

'না, লিব নাই।' ললিতা ঘরের দরজার চৌকাঠে পা রেখে, রুষ্টস্বরে বললো, 'রুকুদিদি ত রোজই চা খায়, আজ খাবে নাই। আজ আমি চা বানাইচি যে!' বলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

শংকর আবার মনে মনে অপ্রস্তুত হাসলো। ওর সকালের চায়ের ভাগীদার কেবল ললিতা না, রুকুবুড়িও। ললিতার তা না জানবার কথা না। মনে করিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তথাপি ললিতার বোধ বুদ্ধি নিয়ে ওর ভুল হয়ে যায়। নুনের মুখে গরম জলটা যেন আরামদায়ক লাগলো, মুখের জ্বরের বিস্বাদ ভাবটাও অনেকখানি কেটে গেল। মুখ ধুয়ে, গরম জলে হাত ভিজিয়ে চোখ দুটো সাবধানে পরিষ্কার করলো।

এই সময়ে রুকুবুড়ি, বালতি ভরে জল নিয়ে রকের ওপর এনে রাখলো। বললো, 'মুখ ধুয়ে লিলে মাষ্টার? আমার জল আনতে দেরি হয়্যা গেল কি?'

শংকর মগটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, 'ন, তোমার দেরি হয়নি রুকুদিদি। আমি আজ গরম জলে মুখ ধুয়েছি।'

'তাই আমি ভাবি কি জল আনতে দেরি হয়্যা গেল।' রুকুবুড়ি তার জামাহীন গায়ের মোটা থানের আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ফোগলা দাঁতে হাসলো।

ঘরের ভিতর থেকে ললিতার স্বর ভেসে এলো, 'অই গ রুকুদিদি,, তোমার জন্যে আজ চা হবে নাই।'

রুকুবুড়ির মুখের ভাঁজে ঢেউ খেললো। একবার তাকালো শংকরের দিকে। শংকর হেসে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। রুকুবুড়ি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ক্যানে গ লাতীন বাম্‌নি, দোষ কি করলাম?'

'দোষ তুমার না, আমার।' ললিতা শাড়ির আঁচল দিয়ে ফুটন্ত কেতলির মুখ খুলে, চায়ের কৌটা থেকে আন্দাজ মতো চা ঢেলে দিল। আবার কেতলির মুখ বন্ধ করে দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গেই কেতলি নামিয়ে, স্টোভের সামনে, ছোট একটা কাঠের পাটাতনের ওপর বসলো। জ্বাল দেওয়া বাসি দুধের পাত্রটা স্টোভের ওপর বসিয়ে দিল। ঠিক শংকর যেমনটি করে। তারপরে দরজার দিকে তাকিয়ে রুকুবুড়িকে বললো, 'আজ তো আর তুমার মাস্টের চা বানাইচে না, আমি বানাইচি। আমি তুমার চায়ের জল লিতে ভুলে গেইচি।' বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ালো।

'কথাটা সত্যি নয় রুকুদিদি, তুমি তোমার চায়ের পাত্তরটি নিয়ে এস!' শংকর তক্তপোষের ওপর বসে বললো। 'আমি ভেবেছিলাম, তোমার চায়ের জল নিতে ললিতা হয়তো ভুলে যাবে। সে কথা বলেছি বলেই, ওই কথা বলছে। আমি বলবার আগেই ললিতা তোমার চায়ের জল নিয়েছে।'

রুকুবুড়ি ফোগলা দাঁতে হেসে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। 'তাই কি হয় গ মাস্টের, লাতীন বাম্‌নি আমার চায়ের জল লিতে ভুল্যে যাবেক? উয়ার মন লজরটি বড় সজাগ বটে।'

'তা বুললে কি হয় রুকুদিদি।' ললিতা বাটিতে মুড়ি ঢেলে,

শংকরের সামনে তক্তপোষে রেখে, আবার স্টোভের সামনে এগিয়ে গিয়ে বসলো, 'আমরা গরীব মুখখু, আমাদের কি সব খেয়াল থাকে? উ সব থাকে বড়লোকের বাড়ির বউঝিদের।' স্টোভের ওপর উথ্‌লে ওটা দুধের পাত্রটা, শাড়ির আঁচল দিয়ে ধরে নামালো। স্টোভের পল্‌তে নামিয়ে দিয়ে, জোরে ফুঁ দিয়ে আগুন নিভিয়ে, আবার কল তুলে পল্‌তে তুলে দিল। ধোঁয়া উঠে ঘরের মধ্যে কেরোসিনের আগুনের গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো।

রুকুবুড়ি ঘরের এক কোণে রাখা তার নিজের কলাইয়ের গেলাসটি এনে, ললিতার সামনে বসিয়ে দিল। বললো, 'উ কথাটি আমি মানি নাই লাতীন বাম্‌নী। গরীব হওয়া, সে ত ভগমানের হাত। মুখখু তুমি লও।'

ললিতা ঘাড় ফিরিয়ে পলকে একবার শংকরকে দেখে নিল। তারপর শংকরের কাঁচের গেলাসে আগে চা ছেকে ঢালতে ঢালতে বললো, 'উ তুমি জান নাই রুকুদিদি, গরীব হলেই মুখখু হয়। আর, সত্যি কথা বটে, আমি লেখাপড়া ত শিখি নাই।'

শংকরের গেলাসে চিনি আর দুধ দিয়ে, চামচে নেড়ে, গেলাস তুলে তক্তপোষের ওপর মুড়ির বাটির কাছে রাখলো।

'তা বুলল্যে মানব ক্যানে লাতীন বাম্‌নি?' রুকুদিদি ফোগলা দাঁতে হেসে বললো, 'নিজের চখে দেখেচি, তুমি ছেলেবেলায় ইস্কুলে পড়্যত্যে যেঁত্যে।'

শংকর জানে, ললিতার নিজেকে গরীব মূর্খ বলার আসল লক্ষ্য চাটুয্যেবাড়ি। রুকুবুড়ির পক্ষে তা বোঝা সম্ভব না। বোধ হয়, ললিতা তা বুঝতে পেরেই, রুকুবুড়ির কথার কোনো জবাব না দিয়ে শংকরকে জিজ্ঞেস করলো, 'মুড়ি কি এমন খাবেন, না একটু তেল নুন মেখ্যে দিব? বলেন তো তেলেভাজা কিনে লিয়ে আসতে পারি।'

'না, তেলেভাজা আজ আর খাবো না। তোমরা খাও তো নিয়ে আসতে পারো, পয়সা দিচ্ছি।' শংকর তক্তপোষ থেকে নামবার উদ্যোগ করলো।

ললিতা প্রায় শংকরের হাত ধরতে উদ্যত হয়ে বললো, 'না না,

আমাদের তেলেভাজা লাগবে নাই, আপনি বসেন। মুড়িতে তেল নুন মেখ্যে দিব ?'

ললিতার গায়ে সামান্য একটা রং চটা পুরনো লাল ব্লাউজ, যার বোতামগুলোও সব নেই। ভিতরে কোনো অন্তর্বাস নেই। বুকের আঁচল সরে যাওয়ায় তার অটুট উদ্ধত বক্ষান্তরের অনেকখানি উন্মুক্ত। শংকরের দিকে হাত বাড়াতেই, জামার কাঁধের অনেকখানি সরে গেল। চকিতেই শংকরের চোখ ওর বুকের থেকে, চোখের ওপর ছুঁয়ে, অন্য দিকে সরে গেল। বললো, 'না, থাক।'

ললিতার মুখে লজ্জার ছটা লাগলেও, তেমন বিব্রত হলো না। বুকের আঁচলটা ভালো করে টেনে জড়িয়ে সরে গেল। শংকর জানে, ললিতার শাড়ি জামার অভাব। অনাথায় এই শীতে গায়ে আরও কিছু জড়াতো। কিন্তু চিত্রটি গরীব ঘরের ঘরকন্না করা ব্যস্ত মেয়েরই মতো অনাড়ম্বর সহজ। এতে ওর নিজেরও বিব্রত হবার কিছু নেই। সেই তুলনায়, এ দেশে পথে ঘাটে মেয়েদের নগ্নতা সব সময়েই চোখে পড়ে।

'এই লাও রুকুদিদি, তোমার চা।' ললিতা কলাইয়ের গেলাসটা বাড়িয়ে দিয়ে, মুড়ির টিনের ঢাকা খুললো, 'মুড়িও লাও।'

রুকুবুড়ি তার ময়লা থানের আঁচল পাতলো। ললিতা দুমুঠো মুড়ি তার আঁচলে দিয়ে দিল। রুকুবুড়ি গেলাসটা নিয়ে ঘরের বাইরে রকের এক পাশে গিয়ে বসলো। শংকরও এ ভাবেই রোজ সকালে দেয়। অনেক সময় মুড়ি ললিতাও দেয়। তারপরে ও নিজের এলুমিনিয়ামের গেলাসে চা ঢাললো। ওর গেলাসটা এ ঘরেই থাকে। নিজেই মুড়ির টিন থেকে এক মুঠো মুড়ি তুলে নিয়ে, টিনের মুখ ঢাকা দিয়ে দিল। আর শংকর মুখে মুড়ি দিয়ে চিবোতে গিয়েই, অস্ফুটে ব্যথাসূচক শব্দ করলো। তাড়াতাড়ি চায়ের গেলাস তুলে চুমুক দিল। মুখের ভিতর মচমচে মুড়ি নরম হয়ে গেল।

'কী হল ?' ললিতা উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসু চোখে মুখ ফিরিয়ে শংকরের দিকে তাকালো।

শংকর ঢোঁক গিলে হেসে বললো, 'মুড়ি চিবোতে গিয়ে, খেয়াল ছিল না। জোরে চাপ দিতেই, একটু ব্যথা লাগলো।' ও চোখের কোলে গালের হাড়ে ব্যাণ্ডেজের ওপর আল্‌তো করে হাত বোলালো।

'চা দিয়ে ভিজিয়ে খান ক্যানে।' ললিতার মুখে উদ্বেগ ও অস্বস্তি, 'তা হলে লাগবে নাই।'

শংকর বললো, 'ব্যথাটা তেমন বেশি নয়। আসলে মুখ নাড়তে গিয়ে চামড়ায় টান পড়লে, একটু লাগছে। আস্তে আস্তে চিবোলে লাগবে না।' সে আর এক গাল মুড়ি মুখে পুরে দিয়ে আস্তে আস্তে চিবোতে লাগলো। সামান্য ব্যথা বোধ হলেও তেমন কষ্ট হলো না। আর এক ঢোক চা গিলে নিয়ে ললিতার দিকে তাকিয়ে হাসলো. 'তুমি ও রকম করে তাকিয়ে রইলে কেন? চা খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

ললিতা ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে অস্বস্তিতে হাসলো। বাঁ হাতে এলুমিনিয়ামের গরম গেলাস তুলে চায়ে চুমুক দিল। ডান হাতের মুঠি থেকে মুড়ি মুখে দিতে ভুলে গেল। বললো, 'মুড়ি চিবাইতেই এত লাগচে, দুফরে কী খাবেন?'

'দুপুরের ভাবনা তো ভাবছি না, সে যা হোক করে চলে যাবে।' শংকর এক মুঠো মুড়ি মুখে দিয়ে আস্তে আস্তে একটু চিবিয়ে নিয়ে বললো, 'ভাবছি, তোমার খুড়োমশাই গজানন কখন আসবে। তার সকাল বেলার পুজোপাট কি এখনো শেষ হয় নি?'

গজাননের তিন ঘর যজমান আছে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে, স্নান করে, আদ্যিকালের পুরনো নানা জায়গায় সেলাই করা একখানি তসরের থান পরে, গায়ে চাদর জড়িয়ে, নারায়ণ শিলা নিয়ে পুজো করতে বেরোয়। মাস গেলে সামান্য কিছু পায়। সেটাও তার উপার্জন। তা ছাড়া বিশেষ পুজা পার্বণে, ব্রাহ্মণীর জন্য লাল পাড় শাড়ি আর নিজের জন্য গামছাও জোটে। সকালে এই কাজ সেরে, তারপরে সে নানান্ ধান্দায় বেরিয়ে পড়ে। অবিশ্যি তার আগে একবার শংকরের সঙ্গে দেখা করে যায়। এক কুজো পানীয় জল নিয়ে আসা, আর ঘরের চাবি নিয়ে, দরজা বন্ধ করা তার কাজ।

'খুড়ো এখুনি এস্যে পড়বে।' ললিতা মুড়ি চিবোতে চিবোতেই জবাব দিল, 'ক্যানে, আজ কি খুড়োর হাতে ভাত খাবেন?'

শংকর চায়ের গেলাস তুলে চুমুক দিয়ে বললো, 'ভাতের কথা ভাবছিই না। গা যখন গরম হয়েছে, আজ আর ভাত খাবো না। সেই জন্যই গজাননকে দরকার। বোসবাড়িতে একটা খবর পাঠানো দরকার, আজ পড়াতে যেতে পারবো না, এ বেলা খাবোও না। তা ছাড়া, ইস্কুলে একটা চিঠি লিখে পাঠাতে হবে, এ শরীর নিয়ে ছেলেদের পড়াতে পারবো না। ছুটির দরখাস্ত পাঠাতে হবে।'

'বলেন তো উ কাজ আমিও করে দিতো পারি' ললিতা চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো।

শংকরের ভুরু কুঁচকে উঠলো, চোখে অবাক জিজ্ঞাসা, 'তুমি যাবে বোসবাড়িতে খবর দিতে, আর ইস্কুলে দরখাস্ত পৌঁছুতে?'

'ক্যানে, কী হবে?' ললিতার ঠোঁটে চোখে হাসি, 'পারব নাই নাকি?'

শংকর জানে, ললিতা তা পারে। কিন্তু সে তো পাঠাতে পারে না। তার চা মুড়ি খাওয়া শেষ। তক্তপোষ থেকে নেমে ওষুধ রাখা কুলুঙ্গির কাছে গিয়ে বললো, 'তুমি হয় তো পারো, আমি তোমাকে পাঠাতে পারি না।' সে ওষুধগুলো বেছে নিয়ে রাংতার মোড়ক ছিঁড়ে, বড়ি বের করলো।

'ক্যানে পারবেন নাই? আমি মেয়ে, তাই?' ললিতা উঠে তক্তপোষ থেকে শংকরের চায়ের গেলাস আর মুড়ির বাটি তুলে নিল।

শংকর এবার খানিকটা বিরক্ত বিস্ময়েই ললিতার দিকে তাকালো, জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার কি মনে হয়, আমার হয়ে বোসবাড়িতে খবর দিতে যাওয়া, ইস্কুলে দরখাস্ত পৌঁছুতে যাওয়া—সবাই খুব ভালো চোখে দেখবে? তোমার লজ্জা করবে না?'

ললিতা ঘরের দরজার দিকে পা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়ালো। ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে তাকালো শংকরের দিকে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কিছু না বলে, রকে গিয়ে রুকুবুড়ির সামনে গেলাস বাটি রেখে বললো, 'এ গুলো ধুয়ে রেখ্য রুকুদিদি।'

'রাখব। তুমার গেলাসটি কুথাকে রাখলে?' ককুবুড়ি জিজ্ঞেস করলো।

ললিতা বললো, 'উটি আমিই ধুয়ে লিব।' ও ঘরে এসে ঢুকলো। দেখলো শংকর তখন কুজো থেকে আর একটা গেলাসে জল গড়াচ্ছে। ললিতা জিজ্ঞেস করলো, 'কী করবেন?'

শংকর জল ভরা গেলাস নিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'ওষুধ খাচ্ছি।' বলে জল মুখে নিয়ে পর পর দুটি বড়ি গিলে নিল।

'লজ্জার কথা বুলচিলেন মাস্টারবাবু?' ললিতা স্টোভের কাছ থেকে নিজের চায়ের গেলাসটা তুলে নিল, তাকালো শংকরের দিকে, 'লজ্জা আছে কি নাই, উ তো জানি নাই। ত, আপনার কুন কাজ করতে আমার লজ্জা হয় না।'

শংকর গম্ভীর স্বরে বললো, 'কিন্তু আমার করে। সব কাজ সবাইকে দিয়ে হয় না, এটা বোঝবার মতো বয়স তোমার হয়েছে। তুমি আমার জন্য বোসবাড়ি যাবে, ইস্কুলে যাবে, এসব দেখলে লোকেই বা কী বলবে? কথা একটা বললেই হলো?'

'আমার যা মনে হইচে, তাই বুলেচি।' ললিতা হাসি মুখেই জবাব দিল, 'লোকের কথায় আমার কিছু যায় আসে না। আসল কথাটা ক্যানে বুলচেন নাই মাস্টারবাবু?'

'কী আসল কথা?'

'আমাকে পাঠাইতে আপনার লজ্জা করে।'

'তা করে বই কি।' শংকর একটু ঝেঁজেই বললো, 'তোমার লজ্জা না করতে পারে, আমার করে।'

ললিতার মুখের হাসি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য মুখটা শক্ত হয়ে উঠলো তারপরেই কেমন অসহায় আর করুণ ছায়া নেমে এলো। বললো, 'দরকারে ঘরের কাজে আমি গাঁয়ের কুথায় না যাই? বাজারে দোকানেও যাই। আপনি ই বাড়িতে থাকেন, আমি ই বাড়ির মেয়ে বটে। আপনার কাজে কুথাও গেলে লজ্জা করবে ক্যানে?'

'কিন্তু আমি তো তোমাদের ঘরের লোক নই, আমার দরকারে তোমার কোন কাজেরও দরকার নেই।' শংকর গেলাসটা নামিয়ে রেখে, তক্তপোষের কাছে এগিয়ে এলো। বালিশের তলা থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে, দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরালো।

ললিতা মাথা নীচু করলো হঠাৎ কোন জবাব দিল না। তারপরে আবার যখন মুখ তুললো, তখন ওর মুখে আবার হাসি ফিরে এসেছে। কিন্তু এ হাসি কান্নার থেকেও অধিক, ব্যথা ও বিষণ্ণতার ভরা। যদিও চোখে জল নেই। কথার স্বর যেন ভেজা ও গভীর, 'আমার ভুল হইচে মাষ্টারবাবু, ভুল্যে যাই আপনি আমাদের ঘরের লোক নন বটে। রেগে গেইচেন, বুঝি, ই ঘরে আমার আসা যাওয়া আপনার ভাল লাগে নাই। যদি বুলেন, ত আর আসব নাই।'

শংকর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ কোন কথা বলতে পারলো না। অনেক সময়েই সে ললিতাকে বিরক্ত হয়ে, ঝেজে কথা বলেছে। ললিতার মুখের হাসি কখনো নেভে নি। বরং জলের হাঁসের মতোই, পাখা ঝাপটা দিয়ে, শংকরের বকুনিকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। দশটা কথা বলে, হেসে, শংকরকেই চুপ করিয়ে দিয়েছে। অবিশ্যি, সে সব প্রসঙ্গ খুবই হালকা। ওর নিজেরই মনে হলো, আজকের মতো কঠিন কথা আর বোধ হয় কখনো বলে নি। অন্ততঃ আর যা-ই বলে থাকুক, নির্লজ্জ কখনো বলেনি। এখন মনে হচ্ছে, ললিতা যা বলেছে, তা'ওর নিজের মতোই বলেছে। ওর পক্ষে শংকরের জন্য বোসবাড়িতে বা ইস্কুলে যাওয়াটা তেমন বিচিত্র ব্যাপার কিছু না। ও যে-সংসারের মেয়ে সে-সংসারের কাজে ওকে ঘরের বাইরে সর্বত্রই যেতে হয়। শংকরের জন্য যেতে হলে, ওর উৎসাহ বাড়ে ছাড়া কমে না। কিন্তু শংকর সবটা মেনে নিতে পারে না। না পারলেও, রেগে ঝেজে কথাগুলো না বললেও হতো। ললিতাকে ও একেবারে চেনে না, বোঝে না, এমন না। ওর মনে অনুশোচনা জাগলো, বিব্রতও হলো।

'নিজের মনটা নিজে বুঝি নাই মাষ্টারবাবু।' ললিতা আবার বললো, 'আপনার ভাল লাগে নাই জানি, তবু ক্যানে না এস্তে

থাকতে পারি নাই, ইয়ার কারণটা জানি নাই।'

শংকর হাসবার চেষ্টা করে বললো, 'তোমাকে আসতে বারণ করবো কেন? তুমি যেমন আসো, তেমনি আসবে। কিন্তু আমি তোমাকে দিয়ে সব কাজ করাতে পারি না, এটা বোঝবার চেষ্টা করো।'

'মাষ্টারবাবু, সংসারে জোর খাটাবার লোকের বড় অভাব।' ললিতা পিছন ফিরে চলে যেতে যেতে বললো, 'যাইচি।'

শংকর কিছু বলবার আগেই, ললিতা ওর গেলাসটা হাতে নিয়ে, দ্রুত ঘরের বাইরে গেল। রক থেকে নেমে, আটচালার উঠোনের পাশ দিয়ে চকিতে অদৃশ্য হলো। শংকর দরজার দিকে কয়েক পা অগ্রসর হলো। ওর মুখেও করুণ আর গম্ভীর ছায়া নেমে এলো।

'আমি তা'লে ইবারে ঘরটা ল্যাপা মোছা করি বাবা?' কুকুবুড়ি দাওয়ায় ওপর উঠতে উঠতে বললো।

শংকর ঘরের বাইরে দাওযায বেরিয়ে বললো, 'হ্যাঁ কর।'

এ সময়েই মনতোষ এলেন হন্তদন্ত হয়ে। মুখে ব্যস্ত উৎকণ্ঠা 'কই হে শংকর মাষ্টার কোথায়?'

'আসুন।' শংকর তাড়াতাড়ি হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা নিচে ফেলে, স্যাণ্ডেলের তলায় চাপা দিল। দেখলো, মনতোষের পিছনে গজাননও দেখা দিয়েছে।

গজানন যে মনতোষের সঙ্গে আসেনি, বোঝা গেল, ঠাকুরদালানের কাছাকাছি তার থম্‌কে দাঁড়ানো দেখে এই শীতের সকালে, তার গায়ে সেই মান্ধাতা আমলের পুরনো জীর্ণ তেলচিটে গরদের একখানি বস্ত্র। অদ্ধেক কোমরে, অদ্ধেক গায়ে জড়ানো। তার ওপরে অবিশ্যি একটি শুকনো মোটা গামছা আছে। হাতে নারায়ণ শিলা। কয়েক ঘর যজমানের বাড়ি প্রাত্যহিক পূজা করে ফিরছে। মনতোষ চাটুয্যেকে দেখে থম্‌কে দাঁড়ানোই স্বাভাবিক। তার কাছে চাটুয্যেরা এখনও জমিদার। মনে আছে ভয় আর সম্ভ্রম, কৃপা প্রার্থীও বটে। কৃপা জুটুক না জুটুক, গাঁয়ের অবস্থাপন্ন যে-কোনো লোকের কাছেই সে জোড় হাতে নতশির কিন্তু যে-কোনো গরীবের কাছেই

সে গজানন মুখুজ্জে, শক্ত মানুষ। আপাততঃ তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি শংকরের দিকে।

'হরির মুখে আর নতুন করে কি শুনব?' মনতোষ বলতে বলতে শংকরের কাছে এগিয়ে এলেন। পোশাকে-আশাকে তিনি কখনোই তেমন ফিটফাট নন। মোটা ধুতি পাঞ্জাবীর ওপরে বেশ কিছুদিনের ব্যবহৃত শাল জড়ানো। পায়ে পুরনো পাম্‌শু। মুখে দু'দিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের দৃষ্টিতে উদ্বেগ। বললেন, 'আমি ত কাল রাতে দেখেই বুঝো নিয়েছি, তোমার অবস্থা সুবিধের না। চখ মুখেব ছিরিই বদলে গেইচে। উদিকে হরির কথা শুন্যে, টাহুর মা, ন' বউ, সব্বাই ব্যস্ত হয়ে পড়েচে।'

শংকর বললো, 'ব্যস্ত হবার কিছু নেই, সামান্য একটু জ্বর আর গায়ে যৎসামান্য ব্যথা। আসুন, ঘরে বসবেন আসুন।'

'না না, এখন আর ঘরে বসব না।' মনতোষ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'এখন কথা হল্য—'

শংকব বাধা দিয়ে বললো, 'তা হলে ঘর থেকে বসবার কিছু নিয়ে আসি।'

'হুঁ হুঁ, ঠাকুর দালানের উপর একখান আসন পেত্যে দিতে বুলচি।' গজানন এগিয়ে এলো, আর তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো, 'ললি, অ ললি, একটা আসন লিয়ে আয়।'

মনতোষ ভ্রূকুটি চোখে গজাননের দিকে ফিরে তাকালেন। গজানন নারায়ণ শিলাসহ দু'হাত কপালে ঠেকালো। মনতোষ ধমক দিয়ে বললেন, 'তোমার চেঁচামেচি থামাও ত হে, আমি ইখ্যানে বসতে আসি নাই। এখনই একবার হাসপাতালে যেয়্যে ডাক্তারকে খবরটা দিতে হবে। কিন্তু মাস্টার, এখন কথা হল্য, এই খারাপ শরীর লিয়ে তোমার ত এ ঘরে একলা থাকা চলবে নাই।'

'আমি তো একেবারে শয্যাশায়ী হইনি, দেখতেই পাচ্ছেন।' শংকর হেসে বললো, 'এ ঘরে একলা থাকতে আমার কোনো কষ্টই হবে না।'

মনতোষ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধমকের সুরে ঝেঁজে উঠলেন, 'তা খাবার

পথ্যি-টথ্যিও কি নিজের হাত পুড়িয়ে রাঁধবে নাকি? উ সব আন্‌তাবড়ি কথা রাখ।' তিনি একবার ঘরের ভিতর দিকে চোখ তুলে দেখলেন, 'হরির মুখে শুনলাম, অনেক বেলা অব্দি বিছানায় পড়েছিলে। এখন নেহাত ঘর নিকাই হইচে, তাই বাইরে এসে দাঁড়িয়েচ, ইয়ার পরেই ত আবার যেয়ে বিছানায় শুবে। বুঝি নাই নাকি, অাঁ?'

'কথাখানি ঠিক বুল্যেচেন গ বাবাঠাকুর।' শংকর কিছু বলবার আগেই রুকুবুড়ি গোবর মাখা দু'হাত জোড় করে, ঘরের বাইরে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালো, 'মাস্টের বাবাকে আজ তক কুন দিন এত বেলা ইস্তক বিছানায় পড়ে থাকতে দেখি নাই। লাতীন বামনি বাবার গায়ে হাত দিয়ে দেখ্যেচে, জ্বর রইচে। সে নিজে মুখ ধুবার গরম জল করে, চা কর্যে খাইয়ে গেল। যমেরা কী মার মেরেচো, বাবার মুখখানি ফুলো কেমন হয়ে গেইচে। ই শরীল লিয়ে একলা ঘরে কখনো পড়ে থাকা যায়?'

মনতোষের ভ্রূকুটি চোখের সঙ্গে গোঁফ জোড়াও যেন খাড়া হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলেন, 'লাতীন বামনিটি আবার কে?'

'আজ্ঞে আমার দাদার বিটি ললি।' গজানন আরও কয়েক পা এগিয়ে এলো।

শংকর রুকুবুড়ির কথায় বিরক্ত বোধ করলেও, রাগ করতে পারলো না। জানে, রুকুবুড়ি অগ্রপশ্চাৎ ভেবে কিছু বলে নি। সে যা দেখেছে এবং বুঝেছে, সেকথাটাই সরল মনে বলেছে। ওর অস্বস্তির কারণ, ললিতার এ ঘরে আসা, শংকরের জন্য চা করা, মনতোষের হয়তো ভালো লাগবে না। অকারণ একটা জটিলতার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা।

মনতোষ বললেন, 'অ, কার্তিকদার মেয়্যে? তা, চা করে খাইয়েচে, বেশ করেচে। এ শরীরে যে নিজে ও সব করতে যাও নাই, ভালই করেচ। তারপরেও আবার বলচ, তুমি এ ঘরে একলা থাকবে?'

ললিতা সকলের কথার মাঝখানেই, একটি হাতে বোনা চটের

আসন নিয়ে এগিয়ে এলো। শংকরের ঘরের দাওয়ায় পেতে দিয়ে, মনতোষের দিকে ফিরে বললো, 'মাষ্টারবাবুর অই রকম কথা। মুখের অবস্থা অইরকম, গায়ে জ্বর, ব্যথা। দেখবার কেউ নাই সেজকাকা, আপনি ওঁয়াকে আপনাদের ঘরে লিয়ে যান।'

মনতোষের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য শক্ত হয়ে উঠলো। পরমুহূর্তেই নরম হয়ে এলো, ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ঠিক বুলোচ। লোক নাই, জন নাই, এ ভাবে রুগী মানুষকে একলা ঘরে ফেলে রাখা যায়? বাড়ি থেকো আমাকে সে-কথাই বলো দিয়েচে।'

'আমি তা'লে নারাণশিলা ঘরে রেখো, একটা রিক্শা ডাকা করো লিয়ে আসি।' গজানন বললো, 'মাষ্টারবাবু না থাকলেও ঘর দরজা দেখবার লোকের অভাব হবে নাই।'

শঙ্কর অস্বস্তিতে হাসলো। গজাননকে বললো, 'রিক্শা তোমাকে ডাকতে হবে না। নারায়ণ শিলা রেখে এস, তোমাকে আমার চিঠি নিয়ে একবার ইস্কুলে যেতে হবে। তার আগে বোস বাড়িতে একটা খবর দিতে যাবে, আমি আজ যেতে পারবো না। দেরি করো না, তাড়াতাড়ি এসো।' ও মনতোষের দিকে মুখ ফেরালো, 'সেজদা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার একলা থাকতে কোনো কষ্ট হবে না। ডাক্তার ওষুধ দিয়েছে, খেয়ে নিয়েছি। জ্বর বলতে গেলে নেই। আজকের দিনটা উপোষ দেব, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কাল দেখবেন, একেবারে ঝরঝরে হয়ে উঠেছি। বউদিদের ভাবতে বারণ করবেন।'

শংকরের নির্দেশ মতো গজানন বাড়ির দরজার দিকে দ্রুত চলে গেল। মনতোষ ভ্রূকুটি অবাক চোখে, ললিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুন্চেচ মাষ্টারের কথা!'

'মাষ্টারবাবু ত অইরকমই বলেন।' ললিতা শংকরের দিকে এক পলক দেখে নিয়ে, ঠোঁটের কোণে হাসলো, 'আপনি ধরাপাকড় করো লিয়ে যান।'

শংকর জানে, ললিতার হাসিতে বিদ্রূপের কাঁটা, কথাগুলো আন্তরিক না। শংকরের চাটুয্যে বাড়িতে যাওয়াটা ওর আদৌ ভালো লাগার বিষয় না। তথাপি মনতোষকে উৎসাহী করে তোলার অর্থ,

এক রকমের উস্‌কে দেওয়া। উদ্দেশ্য শংকরকেই অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলা। কিন্তু শংকর মনে মনে নিজের সিদ্ধান্তে অধিকতর অটল হয়ে ওঠে। মনতোষ ঝেঁজে বললেন, 'তুমি কি নিজের ডাক্তারি নিজে করচ মাস্টার? ডাক্তার কি তোমাকে উপোষ দিতে বুল্যেচে?'

'ডাক্তার বলেনি, আমি নিজেই শরীরের অবস্থা বুঝে বলছি।' শংকর হেসে বলল, 'একটা দিন উপোষ করলে শরীরটা ভালোই থাকবে।'

মনতোষ গায়ের শালটা খুলে একবার ঝাড়া দিয়ে আবার জড়ালেন। ওটি তার উত্তেজনার লক্ষণ বললেন, 'তুমি কি বুঝেচ, উ সব আমি জানতে চাই না। ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, সে উপোষ দিতে বুল্যে কি না, শুন্যে আসি। তোমার একটা দোষ কি জান শংকর? তোমার অই মিটি মিটি হাসি আর আস্তে আস্তে কথা, কিন্তু আসলে তোমার ঘাড়ের একটা রগ একেবারে খাড়া। একবার না করলে, আর হাঁ করান যায় নাই। অই রগটা বঁটি দিয়ে কেট্যে দিতে হয়।'

তিনি ফিরে যাবার উদ্যোগ করে, আবার দাঁড়ালেন। 'আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, তারপরে বাড়িতে যেয়্যে বউদের যা বুলবার বুলচি। তারা যা বুঝবে, তাই করবে, তোমার যা করবার তাই করবে।' বলে হন হন করে ঠাকুর দালানের পাশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ললিতা মনতোষের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে মুখে আঁচল চেপে হাসছিল। নিঃশব্দ হাসিতে ওর শরীর কাঁপছিল। তারপর শংকরের দিকে তাকিয়েই, হাসি থামিয়ে, দাওয়ার ওপর থেকে আসনটা টেনে নিয়ে, বাড়ির দরজার দিকে পা বাড়ালো। শংকরের চোখে বিরক্তি। ও কিছু না বলে, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করলো। ললিতা কয়েক পা গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে, খিলখিল করে হেসে উঠলো, 'অই গ মা, এমন কথা কুনদিন শুনি নাই। ঘাড়ের রগ খাড়া, উটি বঁটি দিয়ে কেট্যে ফেল্যে দিতে হয়!' হাসতে হাসতেই ভিতর বাড়িতে যাবার দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালো, 'জ্বর গায়ে রোদে থাকতে আরাম লাগে বটে, কিন্তু

রোদে না থাকা ভাল। উয়াতে জ্বর বাড়ে।' বলেই বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

শংকরের মুখ গম্ভীর। কিন্তু সেও মনে মনে হাসছিল। ললিতার হাসির সংক্রামণ না, মনতোষের ঘাড়ের রগ কেটে ফেলার কথায় ওরও হাসি পাচ্ছিল। মনতোষ যথার্থই রেগে উঠেছিলেন। যদিও সন্দেহ নেই, সে রাগ স্নেহসঞ্জাতও বটে। কিন্তু নিজের ঘর ছেড়ে, অপরের ঘরে গিয়ে আশ্রয় ও শুশ্রূষার মতো অসুস্থ সে হয়নি। এ রকম তুচ্ছ কারণে, চাটুজ্যে বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব না। তবে উপোষ করে থাকার কথাটা সেও ভাবেনি। তবে কেবল কিছু খাবার জন্য, চাটুয্যে বাড়িতে যাওয়াটা, একটা ঘটা করার মতো ব্যাপার। সে সিগারেট ঠোঁটে চেপে দেশলাই ধরিয়ে, এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লো। আরতি আর মল্লিকার মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

'বল্যোন, কী করিতে হবে।' গজানন তার হাঁটুর ওপর ধুতি আর স্তুতির ময়লা চাদর জড়িয়ে এসে দাঁড়ালো।

ললিতার সাবধানী বাক্য, শংকরের কানে লেগে আছে। কথা মিথ্যে বলে নি। জ্বর গায়ে রোদে থাকতে আরাম লাগে। বিশেষ এই শীতে। কিন্তু রোদ লেগে জ্বর বাড়ারই সম্ভাবনা। জ্বর তেমন বেশি না। হলে, সিগারেট বিস্বাদ লাগতো। ও উঠোন ছেড়ে, ঘরের দিকে যেতে যেতে গজাননকে বললো, 'ভেতরে এসো।'

ঘরের ভিতরে ঢুকে, যথাস্থানে রাখা, কাগজ কলম নিয়ে তক্তপোষে বসলো। গজানন ঘরের মধ্যে ঢুকে, মাটির মেঝেয় বসে, আপন মনেই বকবক করতে লাগলো, 'সেজকত্তা যে-ভাবে এল্যোন, ভাবলাম, আপনাকে ওঁয়াদের ঘরকে না লিয়ে ছাড়বেন নাই। মেজাজটাও দেখলাম, বেশ গরম হয়্যা রইছে।'...

শংকর সে-সব কথার কোনো জবাব না দিয়ে, আগে স্কুলের হেডমাষ্টারের উদ্দেশে অসুস্থতার কথা জানিয়ে, তিন দিনের ছুটির দরখাস্ত লিখলো। বোস বাড়ির কর্তার নামেও একটি চিঠি লিখলো।

বসে বসে চিঠি লিখতেই, নিজেকে অসম্ভব ক্লান্ত মনে হলো। চোয়ালে মাথায় যন্ত্রণাটা বাড়ছে ছাড়া কমছে না। শিয়রের পাশেই একটা মাটির প্রদীপ রাখা আছে, সিগারেটের ছাইদানি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। সিগারেটটা তার মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললো, 'গজানন এই চিঠি দুটো নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। আগে যাও বোস বাড়িতে। এই নাও, এটা হলো বোস বাড়ির চিঠি।'

গজানন তক্তপোষের সামনে এসে, শংকরের হাত থেকে বাঁ হাতে চিঠি নিয়ে, বললো, 'বাঁ হাত বোস বাড়ি।'

'বেশ, এবার ডান হাতে স্কুলের চিঠি।' শংকর আর একটা চিঠি গজাননের হাতে দিয়ে বললো, 'গুলিয়ে ফেলো না।'

গজানন দু হাতে দুটো চিঠি নিয়ে, সামনের দিকে বাড়িয়ে বললো 'উটি আর বুলতে হবেক নাই মাস্টারবাবু। বাঁ হাত বোস বাড়ি, ডান হাত ইস্কুল। আগে বাঁ হাত খালাস, উয়ার পরে ডান হাত।'

'হ্যাঁ, ইস্কুলে গিয়ে হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে যাবে। হেডমাস্টার কে জানো তো?'

'কী বলেন গ মাস্টারবাবু, হেডমাস্টারকে জানি নাই?' গজানন তার কালো মুখে, মোটা বোঁচা নাক ফুলিয়ে হাসলো। 'রাখাল রায়, এমেলে।'

এম. এল. এ-র ওটাই উচ্চারণ। শংকর বললো, 'হ্যাঁ, কিন্তু উনি এখন কলকাতায় আছেন, ওঁকে পাবে না। নারায়ণবাবুকে পাবে।'

'বুইচি, লারাণ পিত রি ত?'

'হ্যাঁ, নারায়ণ পত্রী।' শংকরও ইচ্ছে করেই গজাননের পিত্‌রি পদবীটার উচ্চারণকে শুধুরে দিল। যদিও অর্থহীন, কারণ নারায়ণ পত্রী সকলের মুখেই লারাণ পিত্‌রি। কী করে পত্রী পিত্‌রি হয়, ভাষাতত্ত্বের এ রহস্য ওর অজানা। বললো, 'নারায়ণবাবু হেডমাস্টারের ঘরে না-ও থাকতে পারেন, হয়তো ছেলেদের পড়াবার জন্য ক্লাসে থাকবেন। তুমি খোঁজ করে দেখবে, কিন্তু ক্লাসের ভেতরে যেও না। উনি বেরিয়ে না আসা ইস্তক অপেক্ষা করবে। বাইরে এলে চিঠিটা দেবে। কোন্ চিঠিটা স্কুলে দেবে?'

'ডান হাতেরটা।' গজানন ডান হাত বাড়িয়ে বললো, 'ভুল হবেক নাই গ মাস্টারবাবু, নিশ্চিন্ত থাকেন। তাহলে খাবার জলটা ফিরে এস্যে আনা করব'

শংকর বললো, 'হ্যাঁ, তাই করো, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তুমি বেরিয়ে পড়।'

'হঁ, যাই।' যেন যেতে গিয়েই হঠাৎ মনে পড়েছে, এ রকম একটা ভঙ্গি করে, গজানন ফিরে দাঁড়িয়ে, কুণ্ঠিত হাসলো।

শংকর উঠতে যাচ্ছিল। ভুরু কুঁচকে গজাননের দিকে তাকাল, 'কী হলো? পয়সা? এখন সকালবেলা পয়সার কী দরকার?'

'আর বুলেন ক্যানে মাস্টারবাবু।' গজাননের কুণ্ঠিত হাসি মুখে তৎক্ষণাৎ বিরক্তি ফুটে উঠলো, 'ঘর থেক্যা বেরতে যাইচি, বউ বুললো, দুপুরের ভাতের পাতে দেবার মতন কিছু নাই। ত, ভাবলাম চারগণ্ডা পয়সা হলে, য হক কিছু লিযে আসতাম। ডাল ত পাব নাই, চারগণ্ডা পয়সায় ডাল দিতে চায় না। শীতের বাজারে, এখন একটা ফুল বা বাঁধা কপি-টপি মিলতে পারে।'

শংকর কথা না বাড়িয়ে, বালিশের তলা থেকে খুচরো পয়সা ঘেঁটে, একটা সিকি বাড়িয়ে দিল, 'নাও।'

গজানন ডান হাত বাড়িয়ে বললো, 'ইস্কুলের হাতেই দ্যান।'

এক সিকি মানেই চারগণ্ডা পয়সা। শংকর সিকিটা গজাননের হাতে দিয়ে, তক্তপোষ থেকে নেমে ঘরের একপাশে গেল। মাথাটা আবার টলে উঠলো। কোণের দিকে রাখা, একটা নড়বড়ে টেবিলের সামনে গিয়ে, সেটা ধরে দাঁড়ালো। টেবিলের ওপরে এলোমেলো ছড়ানো এবং থাক করে রাখা একগাদা ইংরেজি বই। সব বইগুলোই ওর প্রিয়, বাছাই করে, অর্ডার দিয়ে, কলকাতা থেকে আনানো। তার মধ্যে মার্কুসের বইটিও মাত্র কয়েকদিন আগে এসে পৌঁচেছে, এখনও উল্টে দেখা হয় নি। কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে চুপচাপ দাঁড়িয়ে, ও নিজেকে একটু সামলে নিল। জ্বরটা বাড়ছে কিনা, বুঝতে পারছে না। চোখ খুলে, বইটি টেনে নিয়ে, আস্তে আস্তে তক্তপোষের ওপর একেবারে কাত হয়ে পড়লো। পায়ের কাছে

রাখা কম্বলটা টেনে গায়ে জড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে, বইটা চোখের সামনে তুলে ধরলো। কিন্তু পাতা ওল্টাবার আগেই মনে হলো, চোখ দুটো যেন জড়ে আসছে। বইটা পাশে রেখে, চোখ বুজলো।

কতক্ষণ সময় কেটেছে, শংকরের খেয়াল নেই। ওর হাতটা কেউ টেনে ধরতেই চোখ মেলে তাকালো। দেখলো সুজিত ডাক্তার ওর নাড়ি দেখছে। ও তাড়াতাড়ি উঠে বসতে গেল। সুজিত বললো, 'উঁহু, উঠবেন না। পালস বিট প্রায় একশোর কাছে। জ্বর রয়েছে, তবু কতোটা একবার দেখি। আজ আর চিতির ধারে যান নি তো?' সে নিচু হয়ে, তার বাক্সোটা তুলে নিল তক্তপোষের ওপর।

শংকর বললো, 'না চিতির ধারে যাই নি বটে, তবে একবার যাওয়া দরকার মনে হচ্ছে।

'মনে হলেও আজ আর এতোটা পথ হেঁটে যাওয়া চলবে না।' সুজিত বাক্সো খুলে, থার্মোমিটার বের করে, শংকরের মুখের মধ্যে জিভের নিচে গুঁজে দিল, 'প্রাকৃতিক কাজটা আজ আশেপাশেই সেরে নেবেন।'

শংকর থার্মোমিটার মুখে নিয়েই ঠোঁট টিপে হাসলো। শালচিতি গ্রামে আসার পরে, কোনো দিনই যে আশেপাশে গড়া অর্থাৎ ডোবার ধারে ঘন আঁকুড় ঝোপে প্রাকৃতিক কাজ সারতে যেতে হয় নি, এমন না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই এতো আদিম, চক্ষুলজ্জার বালাই বলে কিছু থাকে না। রক্ষা করাও সম্ভব না। তবু ভাগ্য ভালো, মেয়েদের আর পুরুষদের আলাদা সীমানা আছে। পাইখানা বলতে গেলে, তথাকথিত সাধারণ ভদ্র গৃহস্থের কারোরই নেই। বাউরি বা অন্যান্য পাড়ার তো কথাই আসে না। বিশেষ সম্পন্নশালী দু চার গৃহে, কুয়ো পাইখানার ব্যবস্থা আছে। স্যানিটারি পাইখানার ব্যবস্থা চাটুয্যে বাড়ি ছাড়া আর কোথাও আছে কি না, শংকরের জানা নেই। সে-বাড়িতে অবিশ্যি শহরের সব ব্যবস্থাই আছে। নলকূপের সঙ্গে পাম্প বসিয়ে বিদ্যুতের সাহায্যে ছাদের ওপর ট্যাঙ্কে জলও সঞ্চিত থাকে। বেসিন আর ট্যাপ-এর ব্যবস্থাও আছে।

সুজিত থার্মোমিটারটা শংকরের মুখ থেকে টেনে বের করে, তুলে দেখলো। ভুরু কুঁচকে বললো, 'হুঁ, জ্বর প্রায় একশো। ব্যথা কী রকম বোধ করছেন ?'

'খুব একটা কিছু না, তবে আছে।' শংকর বললো, 'আসলে দেখছি, কিছু চিবোতে গেলে লাগছে।'

সুজিত বললো, 'তা একটু লাগবে। গালের হাড়ে চোট তো ভালোই লেগেছে। চিবোতে গিয়ে চোয়ালে চাপ পডলেই ওখানে টান পড়ছে।' সে দরজার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এই যে, শুনুন, আপনি থার্মোমিটারটা একটু জল দিয়ে ধুয়ে দিতে পারবেন ?'

শংকর শোয়া অবস্থায় ঘাড় ফেরাবার আগেই ললিতার গলা শুনতে পেলো, 'পারব।'

ললিতা ঘরে ঢুকে এগিয়ে এসে, সুজিতের হাত থেকে থার্মোমিটার নিতে নিতে এক পলক শংকরের মুখের দিকে দেখে নিল।

সুজিত আবার বললে, 'আর একটা কাজ করতে পারলে ভালো হয়। চট্ করে একটু—এই এক কাপ মতো জল গরম করে দিতে পারবেন ?'

'পারব।' ললিতা ঘরের বাইরে যেতে যেতে বললো, 'আপনার রুগীটি আবার রাগ করবেন কি না, সিটি একবার জিজ্ঞেস করে নিবেন।'

সুজিত অবাক জিজ্ঞাসু চোখে শংকরের মুখের দিকে তাকালো। শংকর হেসে, নিচু স্বরে বললো, 'ওকে সকালের দিকে একটু বকে ছিলাম। জল গরম দিয়ে কী হবে ?'

'একটা ইনজেকশন দেবো।' সুজিতও একটু হাসলো, স্টেথিস্কোপটা গলার থেকে কানে লাগিয়ে, শংকরের গায়ের কম্বল টেনে নামিয়ে, বুক এবং পাঁজর দেখলো। স্টেথিস্কোপ কান থেকে নামিয়ে বললো, 'না, কনজেশন্ নেই, তবু একটু সাবধানে থাকবেন, ঠাণ্ডা একেবারেই লাগাবেন না। সকালের ওষুধগুলো খেয়েছিলেন তো ?'

শঙ্কর বললো, 'খেয়েছি।'

ললিতা থার্মোমিটার জলে ধুয়ে, সুজিতের হাতে তুলে দিল। দ্রুত সরে গিয়ে, কেরোসিনের স্টোভ জ্বালিয়ে একটা ধোয়া এলুমিনিয়ামের বাটিতে জল বসিয়ে দিল। সুজিত ইনজেকশনের এ্যামপিউল আর সিরিঞ্জ বের করলো বাক্‌সো থেকে। শংকর জিজ্ঞেস করলো, 'কটা বেজেছে?'

সুজিত কোটের হাতা সরিয়ে কব্জির ঘড়ি দেখে বললো, 'এগারোটা।'

'মাত্র?' শংকর অবাক হাসলো, 'আমি ভেবেছিলাম, অনেক বেলা হয়েছে। তা আপনি হঠাৎ এলেনই যখন, এতো তাড়াতাড়ি এলেন কেন? এ সময় তো আপনার হাসপাতালে প্রচুর রুগীর ভিড়।'

সুজিত বললো, 'হঠাৎ না, আমি একবার আসতামই। আপনার জ্বর হতে পারে, এ রকম একটা অনুমানও করেছিলাম। তার মধ্যেই মনতোষবাবু গিয়ে হাজির।'

'সেটা এখানে এসে শুনিয়েই গেছেন, উনি আপনার কাছে যাবেন।' শংকর বিব্রত সংকোচে বললো, 'অকারণ আপনাকে ব্যস্ত করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু ওঁকে বোঝানো যায় না।'

সুজিত বললো, 'অকারণ ব্যস্ত হই নি, তবে মনতোষবাবু একটু বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবে গিয়ে ভালোই করেছেন, জ্বরের খবরটা তাড়াতাড়ি পেয়ে গেলাম। হাসপাতালে মোটামুটি আমি সামলে এসেছি, আবার এখুনি যাবো। তারপরে আর একবার বেরোতে হবে।'

ললিতা গরম জলের বাটিটা আঁচলে চেপে ধরে তক্তপোষের কাছে এগিয়ে এলো, 'কুথাকে রাখব?'

'এখানেই রাখুন।' সুজিত তার বাক্‌সোটা একটু সরিয়ে রাখলো।

ললিতা গরম জলের বাটি রেখে, আর একবার শংকরের মুখের দিকে দেখে, দরজার কাছে সরে গেল। সুজিত গরম জলে সিরিঞ্জ ডুবিয়ে সুঁচে কয়েকবার জল টেনে ঢাললো, ফেললো। গোটাটা খুলে, জল ঝেড়ে শুকিয়ে নিল। এ্যামপিউলের মুখ কেটে সিরিঞ্জে ওষুধ ভরতে ভরতে হেসে বললো, 'থানার বড়বাবু আমার ওপর খুবই

চটেছেন, সেই সঙ্গে অঞ্চল প্রধান আর মাতব্বররাও। শুনলাম, আজ সকালেই বাঁকুড়ার ডি. এম. ও-র কাছে ওরা লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'তার মানে, আপনার রিপোর্টটা যাতে কাজে না লাগে।' শংকর হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু আপনার রিপোর্ট কি পাঠিয়েছেন?'

সুজিত বললো, 'নিশ্চয়ই। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আর ডিস্ট্রিক্ট মেডিকেল অফিসার দুজনের কাছেই আমার রিপোর্ট আজ সকালেই পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার কাজ আমি করেছি, এখন কর্তারা যা করেন।' সে তুলোয় স্পিরিট ভিজিয়ে, শংকরের বাঁ হাতটা টেনে নিল। নিজেই ওর পাঞ্জাবীর হাতাটা গুটিয়ে বললো, 'মাস্‌ল শক্ত করবেন না।' সুঁচ ঢুকিয়ে ইনজেকশন দিয়ে আবার গরম জলে সিরিঞ্জ পরিষ্কার করতে করতে বললো, 'আমি তো ব্যাপারটাকে হোমিসাইডাল বলিনি, কিন্তু এফ আই আর পর্যন্ত করা হলো না, এটা কী রকম ব্যাপার? তা ছাড়া, এই এ্যাকসিডেন্টের সঙ্গে ড্রাইভারের অপরাধী মনোভাব তো চাপা থাকে নি। তা হলে আপনার এ অবস্থা হতো না।' সে সিরিঞ্জ বাক্‌সোর মধ্যে রেখে উঠে দাঁড়ালো, 'এক সময়ে গ্রামের মানুষের সেবার খুবই উৎসাহ ছিল। গ্রাম সম্পর্কে ধারণাও অন্য রকম ছিল। এখন দেখছি, জীবনের ধারণাগুলো খুবই অবাস্তব।' সে একবার দরজার কাছে ললিতার দিকে দেখলো, 'যাই হোক, এখন এ সব কথা আলোচনার সময় নেই। আশা করি জ্বরটা আর বাড়বে না। ওবেলা যদি পারি, একবার ঘুরে যাবো।'

'না না, ওবেলা আর আসতে হবে না।' শংকর উঠে বসলো, 'এক মিনিট দাঁড়ান, আপনার—।'

'ভিজিট?' সুজিত হাসতে হাসতে বাক্‌সো নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, 'পরে দেবার অনেক সময় পাবেন। এখন শুয়ে থাকুন। ওষুধগুলো সময় মতো খাবেন।'

ললিতা জিজ্ঞেস করলো, 'ডাক্তারবাবু, মাস্টারবাবু কি আজ উপোষ দিবেন?'

'উপোষ দেবেন কেন?' সুজিত ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে পড়লো,

'ভাত না খেলেই ভালো। তবে শক্ত কিছু তো খেতে পারবেন না। দুধ খই বা পাতলা গরম খিচুড়ি চলতে পারে। উপোষ দেওয়া মোটেই উচিত হবে না।'

ললিতা বললো, 'মাস্টারবাবু বুলছিলেন, একটা দিন উপোষ দিলেই নাকি সব সেরে যাবে।'

'না, এটা তো সেরকম জ্বর নয়।' সুজিত হেসে বললো, 'তবে মনতোষবাবুই বোধ হয় সে ব্যবস্থা করবেন। উনি হাসপাতালে আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। ওঁর কাছেও শুনলাম, শংকরবাবু উপোষের কথা বলেছেন।' সে শংকরের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলো, 'উপোষ করবেন না, দুবল হয়ে পড়বেন। ওষুধগুলো একটু কড়া ডোজের আছে।' সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শংকর দেখলো, সুজিতের সাইকেল রকের গায়ে ঠেকিয়ে দাঁড় করানো। সুজিত নেমে সাইকেল নিয়ে, আটচালার আড়ালে চলে গেল। ললিতা তখনও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। শংকর মুখ ফিরিয়ে আবার আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লো।

'আপনার ছাত্তর ছাত্তীর আপনাকে দেখতে আইচিল।' ললিতার স্বর শোনা গেল, 'অই কি নাম উয়াদের, চাঁদু আর বিবি, সেজকাকার ছেলে মেয়ে। আমার বুলবার কথা লয় বটে, ত চখে দেখলাম, তাই না বুল্যে পারলাম না।'

'কখন এসেছিল?' শংকর মুখ না তুলে জিজ্ঞেস করলো।

ললিতা বললো, 'হরিদার সঙ্গে ইস্কুলকে যাবার পথে আইচিল' আপনি ঘুমাচ্ছিলেন। উয়ারা আর ডাকাডাকি করে নাই।'

'হুঁ!' শংকর শব্দ করলো, 'তুমি যেন আমার ওপর মিছিমিছি রাগ করে থেকো না।'

শংকর জবাবের প্রত্যাশা করেও, কোন জবাব না পেয়ে, খানিকক্ষণ পরে বালিশ থেকে মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে দেখলো। ললিতাকে দেখতে পেলো না। কিন্তু ললিতা যে চলে যায় নি, তাও ও বিলক্ষণ জানে। সারা দিনই আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে। সুজিত আসার সময় ললিতা নিশ্চয় কাছেপিঠেই ছিল। এবং না থাকলে,

থার্মোমিটার ধোয়া বা জল গরম করে দেওয়া, এ সব সুজিত নিজেই করতো। শংকরকে উঠতে দিতো না। সুজিতকেও ওর বিলক্ষণ জানা আছে।

শংকরের ঘুম ঘুম ভাবটা ছিলই। ও আবার চোখ বুজলো, এবং আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইলো। আচ্ছন্নতার মধ্যে ঘুম নেমে এলো একটু পরেই। আবার এক সময়ে ঘরের মধ্যে লোকের চলাফেরার শব্দে, চোখ মেলে তাকালো। দেখলো, হরি এসেছে। মেঝেয় নামানো একটি টিফিন কেরিয়ার। জিজ্ঞেস করলো, 'কী ব্যাপার ?'

'পাতলা গরম খিচুড়ি লিয়া আইচি, মায়েরা পাটিয়ে দিল্যে।' হরি বললো, 'আমি মেঝেয় ঠাঁই করে দিছি, গরম গরম একটু খেয়্যে ল্যান। ডাক্তারবাবু বুল্যে দিইচেন।' শংকর আস্তে আস্তে উঠে দরজার দিকে তাকালো। আশা করেছিল, ললিতাকে দেখতে পাবে। কিন্তু দেখা গেল না। চাটুয্যেবাড়ি থেকে এ রকম কিছু আসবে, এটাও সে অনুমান করেছিল। যেমন তার অনুমান, ললিতা আশেপাশেই কোথাও আড়াল থেকে সব কিছু দেখছে। ও কোনো রকম মন্তব্য না করে, তক্তপোষ থেকে নেমে, বাইরের রকে গিয়ে হাত ধুয়ে ফিরে এলো। হরি আসন পেতে থালা সাজিয়ে প্রস্তুত। শংকর বসে পড়লো। হরি টিফিন কেরিয়ার খুলে, গরম পাতলা খিচুড়ি পাতে ঢেলে দিল। গন্ধটা নাকে গিয়ে, শংকরের মনে হলো, খিদে পেয়েছে। কিন্তু আর একটা বাটিতে দুধ দেখে বললো, 'ওটা আর চলবে না, ফিরিয়ে নিয়ে যাও। খিচুড়িতেই আমার হয়ে যাবে।'

'দুধ না খেলে, বল পাবেন নাই মাস্টারবাবু, মায়েরা বুল্যে দিইচেন।' হরি বললো।

শংকর বললো, 'মায়েদের বলো, আমার বল যথেষ্ট আছে।'

খাওয়ার শেষে, শংকর হরিকে বিদায় দিয়ে, রকে গিয়ে মুখ ধুয়ে নিল। এবার আর এক প্রস্থ ওষুধ। খেয়ে নিয়ে, সিগারেট ধরালো। খুব বিস্বাদ লাগছে না। শরীরটা ঘেমে, একটু যেন হালকা লাগছে। গালে কপালে ব্যথাও কম বোধ হচ্ছে। ও মার্কুসের বইটা টেনে নিল।

সন্ধ্যার আগেই গজানন এসে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দিল। সেই সঙ্গে দুটো ধূপকাটি। পুব মুখো হয়ে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বোধ হয় কিছু প্রার্থনা বা মন্ত্র আউড়াচ্ছিল। এই সময়ে, দরজার কাছে ছায়া পড়লো। শংকর চোখ তুলে দেখলো, আরতি—চাটুয্যেবাড়ির সেজবউ। হ্যারিকেনের আলোয় তার ঘোমটা ঢাকা মুখের অনেকখানিই দেখা যাচ্ছে। পিছনে যে মল্লিকা দাঁড়িয়ে আছে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হলো না।

শংকর ব্যস্ত হচ্ছে তক্তপোষ থেকে নামতে গেল। আরতি ঘরের মধ্যে ঢুকে বললো, 'থাক, নামতে হবে না।' পিছন ফিরে ডাকলো, 'আয়।'

রকের ওপর উজ্জ্বল হ্যারিকেন হাতে হরিকেও দেখা গেল। দরজার কাছে হ্যারিকেন রেখে সে ঘরে ঢুকলো। তার অন্য হাতে একটি মুখ ঢাকা হিণ্ডেলিয়ামের ঝকঝকে পাত্র, এবং মুখ বন্ধ টিফিন কেরিয়ারের একটি বাটি। দুটোই সে ঘরের একপাশে রেখে ঘরের বাইরে গিয়ে আড়ালে চলে গেল। গজাননের দু'চোখ ভরা বিস্ময়। যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না, এমন ভাবে হাঁ করে ধূপকাঠি হাতে নিয়ে আরতি আর মল্লিকার দিকে তাকিয়ে রইলো।

আরতির কথা রাখা শংকরের পক্ষে সম্ভব হলো না। ও তক্তপোষ থেকে নেমে দাঁড়ালো। আরতি আর মল্লিকার এখানে আসা, ওর আছেও একান্ত অপ্রত্যাশিত। অবাক হয়ে বললো, 'আপনারা এখানে, এই সন্ধেবেলায়?'

'তা বটে। সেঁজের বেলা ঘরের বউকে চৌকাট ডিঙাতে নাই।' আরতি মল্লিকার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলো। নাকছাবির হীরের ঝিলিক দিল, 'শাস্ত্রে বলেছে, সেঁজের বেলা পুরুষের মোহন রূপ ধরে, অপদেবতা হাতছানি দেয়। আমাদেরও বোধ হয় সে রকম কেউ হাতছানি দিয়ে ঘরের বার করে নিয়ে এসেছে।' মল্লিকা ঘরে ঢুকে, দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আরতির কথায়, গায়ের লাল রঙের ফুল তোলা শাল তুলে মুখে চাপা দিল।

'অপদেবতার মুখে ছাই। সেজ বউঠান, আপনারা হলেন ঘরের লক্ষ্মী ঠাকরুণ, উ শালার কী ক্ষ্যামতা আছে, আপনাদিগে হাতছানি দিবেক?' গজানন কথা বলতে-বলতেই কয়েকবার জ্বলন্ত ধূপকাটি কপালে ছোঁয়ালো।

আরতি এবার চমকে উঠে ভ্রূকুটি চোখে গজাননের দিকে দেখলো। তারপরে শংকরের দিকে তাকালো জিজ্ঞাসু চোখে। শংকর বললো, 'এ হলো গজানন—গজানন মুখুজ্জে, এ বাড়ির বাসিন্দা।'

'সেজদা ন'দা সবাই আমাকে চিনে।' গজানন আরতি আর মল্লিকার উদ্দেশ্যে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বিগলিত হেসে বললো, 'মাস্টারবাবুর ঘর দরজা আমিই দেখি, চাবি আমার কাছকে থাক্যে। খাবার জল কাউকে আনতে দিই না, আমি নিজে আনা করি।'

আরতি শংকরের দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখে মুখে রুদ্ধ হাসির ছটা, বললো, 'তা সন্ধ্যে বাতি দেখিয়ে ধূপ জ্বেলেই কি শেষ? শাঁখ বাজানো হবে না?'

'অই—অই কথাটি কে বুলবেন গ সেজ বউঠান!' গজানন বিশেষ উৎসাহে বলে উঠলো, 'মাস্টারবাবুকে কত্ত দিন বুলা করিচি—'

শংকর গলা খাকরি দিয়ে বললো, 'গজানন, তুমি বরং এখন এসো।'

গজানন থতমত খেয়ে চুপ করে গেল। তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে মাটির একটি ধূপদানে, কাঠি দুটি গুঁজে দিল। শংকর বালিশের তলা থেকে একটি আধুলি বের করে, হাত বাড়িয়ে বললো, 'এটা নিয়ে যাও।'

গজাননের কালো মুখে লজ্জার হাসি ফুটলো। হাত বাড়িয়ে আধুলিটি নিয়ে, আরতি আর মল্লিকার উদ্দেশ্যে আবার দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বেরিয়ে গেল। আরতি খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, 'তা মাস্টার ঠাকুরপোর দেখাশোনা করার লোকটি জুটেছে ভালো। এর কথা আপনার মুখেই শুনেছি, আজ চোখে দেখা হলো। কিন্তু এখন পয়সা দিলেন কিসের?'

'চার আনা আট আনা পয়সা রোজই দিয়ে থাকি।' শংকর বললো, 'পয়সাটা বেশির ভাগ দিনই বোধ হয় বাউরিপাড়ায় খরচ করে আসে। না চাইলে কোনো দিনই দিই না। আজ না চাইতেই দিলাম। কিন্তু সে কথা যাক। আপনারা দুজনে হঠাৎ এ ভাবে এ সময়ে এখানে আসতে গেলেন কেন? সেজদা জানেন?'

আরতি মল্লিকার দিকে ফিরে তাকালো। তার লালপাড় সাদা শাড়ির ওপরে কালো রঙের গরম শাল অনেকটাই স্খলিত। চোখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী রে ন' তোর সেজো ভাসুর জানে তো, আমরা যে এখানে এসেছি?'

'তিনিই তো আমাদের আসতে বললেন।' মল্লিকা শংকরের দিকে তাকিয়ে বললো, এবং কয়েক পা এগিয়ে এসে আরতির পাশে দাঁড়ালো, 'অবিশ্যি সেজদি আগেই আসবার কথা বলেছিল।'

আরতি শংকরের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট উলটে বললো, 'আমি মুখ ফুটে বলেছি, কিন্তু আপনার মল্লিকার একদম আসার ইচ্ছে ছিল না।'

শংকর মল্লিকার দিকে তাকালো। মল্লিকা হেসে চোখ নত করলো। শংকর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললো, 'দাঁড়িয়ে কেন, আপনারা বসুন সেজো বউদি।'

আরতি বললো, 'বসছি, অসুখ শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে আগে আপনি বসুন।' সে ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে, তক্তপোষের কাছে এগিয়ে এলো, 'এখন আছেন কেমন?'

'ভালো।' শংকর বললো, 'জ্বরটা হয়তো আছে, তবে সে-রকম কিছু না।'

আরতি তক্তপোষের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে ডাকলো, 'আয় ন' এ তক্তপোষে বসার সুযোগ আর কোন দিন হয়তো পাবি নে।'

শংকর ম্লান হেসে বললো, 'গরীবের বিছানা, আপনাদের বসতে কষ্ট হবে।'

'তা বটে! বড় ঘরের বউ তো আমরা।' আরতি চোখে ঝিলিক হানলো, 'তবু মাঝে মাঝে এমন গরীবের বিছানায় বসাটা ভাগ্যে না থাকলে হয় না। আমার না, ওর ভাগ্যের কথা বলছি।' মল্লিকার

দিকে আঙুল তুলে দেখালো। শংকরের দিয়ে তাকিয়ে হুস্ করে একটা নিশ্বাস ফেলে আবার বললো, 'এ ঘরটা দেখবার জন্যে আমারও অনেক দিনের সাধ ছিল। এ বিছানায় বসাটা আমারও ভাগ্য, তবে বলি কী করে ? ন' বউয়ের হিংসে হবে।'

মল্লিকা শংকরের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আরতিকে বললো, 'কতো হিংসে হবে, সে তুমি ভালোই জানো সেজদি। কিন্তু শংকরদা বসছেন না।'

'সত্যি, এ সব লোককে আমি একটুও সহ্য করতে পারি নে।' আরতি অসংকোচে হাত বাড়িয়ে শংকরের একটা হাত টেনে ধরলো, 'বসুন তো। ভয় নেই, গায়ে গা ঠেকিয়ে বসবো না।'

শংকর অস্বস্তি আর বিব্রত বোধ করলো। তক্তপোষের এক ধারে বসলো। আরতি একটু সরে গেল। মল্লিকা এসে তার পাশে বসলো। কয়েক মুহূর্ত কারোর মুখেই কোন কথা নেই। মল্লিকা আরতির দিকে তাকালো। আরতিও তাকালো। এবং বললো, 'তুই বল্ না।'

মল্লিকা শংকরের দিকে তাকালো। মুখে লজ্জা, চোখে কুণ্ঠা, বললো, 'শংকরদা, এ শরীর নিয়ে একলা এখানে থাকাটা ঠিক নয়। কয়েকটা দিন আমাদের বাড়ীতে থাকবেন চলুন।'

'এ বিষয়ে যা বলবার, সেজদাকে ওবেলাই বলে দিয়েছি।' শংকর হেসে বললো, কিন্তু ওর মনটা শক্ত হয়ে উঠলো, 'আমাকে ভুল বুঝো না তোমরা। কোনো ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ভালো নয়। ওবেলা খাবার পাঠিয়ে দিয়েছো, সেটা ঠিক আছে। হয়ত এ বেলাও কিছু খাবার নিয়ে এসেছো। কিন্তু তোমার আর সেজো বউদির এ ভাবে আসাতেও আমার অস্বস্তি হচ্ছে।'

'কেন ?' আরতি ভ্রূকুটি গম্ভীর মুখে তাকিয়ে বললো, 'একটা অসুস্থ লোককে দেখতে আসব না ?'

শংকর হেসেই বললো, 'এমন কিছু অসুস্থ হইনি যে, আপনাদেরও এভাবে দেখতে আসতে হবে। সেজদা এসেছিলেন। হরি তো আসছেই।'

'তার মানে কি রে ন' ? আমাদের কি তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে

নাকি?' আরতির স্বরে ক্ষোভের সুর।

শংকর হাত জোড় করে বললো, 'ছি ছি, তা কি করে হয়? আপনাদের আসাটা ভাগ্যের কথা, সেইজন্য চোখেও পড়ে বেশি। আসলে আমার লজ্জা করে।'

'এ তো আশ্চর্যের কথা!' আরতি বললো, 'নিজেদের আপনজনের অসুখ করলে দেখতে আসব, এতে লজ্জাটা কিসের?'

শংকর তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিতে পারলো না। এক রকম অসহায় ভাবে হাসলো। তার পক্ষে মুখ ফুটে বলা সম্ভব না। শালচিতির চাটুয্যে বাড়ির আপনজন হয়ে ওঠা তার পক্ষে এক রকমের অনুচিত। বিষয়টি একদিক থেকে জটিল এবং বিভ্রান্তকর বিশেষ করে, শংকরের অসুস্থতার জন্য, দেবতোষ এবং মনতোষ চাটুয্যের স্ত্রীদের দেখতে আসা, গ্রামবাসীর পক্ষে বহু প্রশ্ন ও অনুমানের বিষয়। এতে আর যাই হোক, নিতান্ত গৃহশিক্ষকের ভূমিকাটা যেন ঠিক বজায় থাকছে না। তার থেকে অধিকতর কিছু। অথচ বিষয়টিকে এ চোখে যাদের দেখবার কথা, তারা তা দেখছে না। ভাবতে হচ্ছে শংকরকে। এবং ও জানে, যে-পরিপ্রেক্ষিতে এই যুক্তি ও ভাবনাগুলো ওর মনে আসছে, তা নিতান্ত লোকচক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি। সামাজিক পটভূমিতে মানুষকে দেখা। হৃদয় এবং মনের বিষয়টি এখানে অনুপস্থিত। মনতোষ ওকে নিতান্ত গৃহশিক্ষক মনে করেন না। গ্রাম সমাজের কোনো বিতর্কিত বিষয়েই যে নেই, এমন এক প্রবাসী শিক্ষিত যুবকের প্রতি তাঁর মনে স্নেহের অনুভূতি আছে। সেই অনুভূতিটিকে আরতি নিশ্চয় গভীর করেছে, কারণ শংকরের প্রতি তার প্রীতি ও ভালবাসা অনেকটা বন্ধুর মতো। অপরের বিবাহিতা স্ত্রী হয়েও, মল্লিকার অতীতের মুগ্ধতা, এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে তাকে যেন জীবনের প্রথম প্রেমের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অথচ সেই প্রেম এক বন্ধ ঘরের আর্তি ছাড়া আর কিছু না। তার কোনো গতি ও বিকাশের অবকাশ নেই। এ প্রেমের জন্ম কেবল অন্ধ জটিল আবর্তে মাথা খুঁড়ে মরবার জন্য। এবং তা উভয়তঃ।

শংকর অমানুষ বা অতিমানব না। সংসারে সকলের মন রেখে চলা যায় না, এটাও ও বিলক্ষণ জানে। মানুষের নিঃস্বার্থ ভালবাসা পাওয়া দুর্লভ, এবং ভাগ্যের বিষয়। শালচিতির চাটুয্যে বাড়ি এবং আরও যাদের স্নেহ প্রীতি ভালবাসা ও পেয়েছে, সেজন্য ও কৃতজ্ঞ। কিন্তু ও যাদের কাছে অপ্রীতিভাজন, তাদের কাছে ওর সব থেকে বড় অপরাধ, চাটুয্যে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ। এর সঙ্গে সমাজ আর রাজনীতি জড়িয়ে আছে। থাকলেও, শংকর চাটুয্যে বাড়ির সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত যোগাযোগ ছিন্ন করে নি। ও গ্রাম সমাজকে অতিক্রম করে নি। রাজনৈতিক বিরুদ্ধতাকে প্রশ্রয়ও দেয় নি। হৃদয়ের গভীরে যা কিছু ঘটেছে, সে যন্ত্রণা মল্লিকার সঙ্গেও ভাগাভাগি করা যায় না। তার যা কিছু কষ্ট ও যন্ত্রণা, তা নিতান্তই ওর একার। সেখানে বাইরের কারোর প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু আরতি আর মল্লিকার সন্ধ্যাবেলা এই অপ্রত্যাশিত আগমন, পরিস্থিতিকে কেবল জটিল আর ঘোলা করবে। হয়তো, কিছুটা বিষাক্তও করে তোলা হবে। শংকরের অস্বস্তি সেখানেই।

'কী হলো, একেবারে চুপ করে রইলেন যে?' আরতি জিজ্ঞেস করলো।

শংকর হেসে বললো, 'জবাব দেবার তো তেমন কিছু নেই সেজবউদি। আপনি তো ভুল বা অন্যায় কিছু বলেন নি। কিন্তু আপনারা যতো সহজে আমাকে আপনাদের আপনজন করে নিয়েছেন, লোকেরা ততো সহজে সেটা মেনে নিতে চায় না।'

'লোকেরা কী চায় না চায়, তা দিয়ে আমাদের দরকার কী?' আরতি ভ্রূকুটি বিরক্ত মুখে বললো, 'আমরা এসেছি আপনাকে দেখতে। লোকেদের যদি ভালো না লাগে, না লাগবে।'

শংকর হেসে চুপ করে রইলো। আরতির এত স্পষ্ট কথার সামনে সহজে কিছু বলা যায় না। কিন্তু মল্লিকা ওর নম্র স্বরে হেসে বললো, 'সেজদি, শংকরদার কথাটা তুমি বুঝতে পারো নি। তুমি আমি লোকের কথা না ভাবলেও, শংকরদাকে ভাবতে হয়, সে কথাটাই উনি আমাদের বুঝিয়ে দিতে চাইছেন।'

আরতি ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসু চোখে শংকরের দিকে তাকালো। শংকর তাকালো মল্লিকার দিকে। মল্লিকা দ্বিধার সঙ্গে বললো, 'ভুল বলেছি শংকরদা ?'

শংকর জবাব দেবার আগে একটা সিগারেট ধরালো, বললো, 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক।'

মল্লিকা আরতির দিকে একবার দেখে, শংকরের কথার জবাবে বললো, 'হয় তো নয়, আমার কথাটাই একশো ভাগ সত্যি। যদি এতদিনে আপনার মন কিছু বুঝে থাকি। আর এ কথাও বলবো, আপনার দিক থেকে এরকম ভাবাটাই স্বাভাবিক।'

আরতির ভুরু কুঁচকে উঠলো। স্ফীত হলো নাসারন্ধ্র। মল্লিকাকে বললো, 'তুই দেখছি মাষ্টার ঠাকুরপোর সাপুট করছিস। কিন্তু কোন্ দুঃখে লোকের কথা ভাবতে যাব, তা তো ছাই বুঝতে পারছি না ? এমন না যে ঘর বরকে লুকিয়ে পর পুরুষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তাতে যদি লোকে মন্দ কিছু ভাবে, ভাববে। আমাদের কী যায় আসে ?'

'আমাদের কিছু যায় আসে না।' মল্লিকা শংকরের দিকে চোখ রেখেই বললো, 'শংকরদার যায় আসে। শংকরদাকে তো গাঁয়ের সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে।'

শংকর জানে, মল্লিকার কথার মধ্যে ওর প্রতি বিশেষ একটি খোঁচা আছে। যদিও কথাগুলো শোনাচ্ছে, শংকরের প্রতি সমর্থনের মতোই। কিন্তু মল্লিকার খোঁচাও নিরর্থক। গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে মানিয়ে চলার একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। সেটাকে কোনো রকমেই লোকের মন যুগিয়ে চলা বলা যায় না। ও মল্লিকার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'এ প্রসঙ্গ তো চুকে গেছে, এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে আর লাভ কি ?' ও আরতির দিকে তাকালো, 'সংসারটা মোটেই সহজ জায়গা না, এটা হলো মোদ্দা কথা। ভুল বলেছি সেজ বউদি ? আপনিই বলুন, এ সংসারে কে কার মন বুঝতে চায় ? যাদের বোঝাবুঝি আছে, তাদের আছে, অন্যের কাছে তার কানাকড়ি দাম নেই। স্নেহ ভালবাসা যে মানুষের সকল বৃত্তির সার, এ কথাটাও

সহজে কেউ মেনে নিতে চায় না। চায় কী?'

আরতি মল্লিকার দিকে একবার দেখলো। তার মুখের হাসিতে নেমে এলো ম্লানতা। বললো, 'কথাটা ভুল বলে নি মাষ্টার ঠাকুরপো। সংসারটা বড় ঘোরপ্যাঁচের জায়গা। তবে আমার সোজা কথা। আমার মন মজেছে যাহার সনে, প্রাণ চাহে তারে। তারপরে তোরা হাদ্দ্যাখ্‌ মোর কলাটা।'

আরতির কথার ভঙ্গিতে ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দর্শানোয় শংকর হেসে উঠলো। মল্লিকার ঠোঁটে ঈষৎ হাসি, দৃষ্টি আরতির দিকে, 'কিন্তু আসল কথাটার কোনো জবাব মিলল না।'

'হ্যাঁ, আমাদের বাড়ীতে যাবার কথাটা।' আরতি বললো। 'সেটার তা হলে কি হবে?'

শংকর বললো, 'এত কথার পরে, ওটার জবাব তো আর নতুন করে কিছু দেব নেই? কোনো দিন যদি সে-রকম অবস্থা হয়, তা হলে নিশ্চয়ই যাবো। আপাততঃ তার কোনো দরকার নেই।'

আরতি মল্লিকার দিকে তাকালো। মল্লিকা তার দিকেই তাকিয়ে বললো, 'অবুঝের মতো জোর করবো না, করলেও সে-জোর খাটবে না।'

শংকর মল্লিকার দিকে তাকালো। মল্লিকাও তাকালো, এবং হঠাৎ বললো, 'বুঝেছি। আপনাকে কিছু বলতে হবে না।'

'চোখে চোখে কথা, কিছু বুঝতে পারিনে বাপু!' আরতি নিঃশ্বাস ফেললো, 'আসলে কি জানেন মাষ্টার ঠাকুরপো, আমরা মেয়েমানুষরা রক্ত মাংস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে ভালবাসি—মানে মানুষ নিয়ে। কথাটা শুনলে লোকে কি ভাববে, কে জানে? আবার সেই লোকের কথাই আসছে ছাই। কিন্তু কথাটা বুঝতে হলে, মেয়েমানুষের শরীর আর মন চাই। নিজের মতন করে কারোকে যদি ঘাঁটাঘাঁটি না করতে পারি, তবে সব যেন কেমন ফাঁকা লাগে।' আরতি আরও কিছু বলতে গিয়ে, মল্লিকার তাকিয়ে থেমে গেল।

শংকর জানে, আরতি প্রকৃতপক্ষে মল্লিকার কথাই বলতে চাইছে। মল্লিকার জীবনের শূন্যতার কথা। নারী চরিত্রের এটাও কি একটা

বৈশিষ্ট্য, যখন অন্য নারী তার প্রতিপক্ষের ভূমিকায় থাকে না, তখন তার সমর্থনে, সমাজ নীতি সবই অগ্রাহ্য করতে চায়? অথবা তার নিজের মধ্যেই কোনো শূন্যতা বোধ, তাকে সচেতন বা অবচেতন প্ররোচিত করে? আরতির রক্তমাংস বা মানুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি প্রকৃত অর্থ বুঝতে অসুবিধে হয় না। সেই সব মানুষেরা স্বামী পুত্র স্নেহের ও ভালবাসার পাত্র পাত্রী। সেই দিক থেকে, আরতিকে শূন্যতায় হাতড়ে বেড়াতে হয় বলে মনে হয় না। মনতোষকে সে ভালবাসে। সন্তানদের প্রতি আছে তার প্রকৃতিগত স্নেহ ও সজাগ দৃষ্টি। কিন্তু নিজের দেবর দেবতোষের প্রতি কি তার কোনো আত্মিক আকর্ষণ নেই? দেবতোষের সঙ্গেও তার সম্পর্ক বন্ধুর মতোই। অথচ শংকরের প্রতি মল্লিকার দুর্বল স্থানটিকে সে কেবল লালন করে না। স্পষ্টতঃই প্রশ্রয় দেয়। পরিণামের কথা কি একবারও মনে হয় না? এ সমবেদনার স্বরূপ কী?

এ সমবেদনার স্বরূপ, নারীর আত্যন্তিক প্রবৃত্তিজাত চেতনা। শহরের শিক্ষিতা আর গ্রামের তথাকথিত অশিক্ষিতা, এ ক্ষেত্রে নারীর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। আরতির রক্তমাংস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার কথাটার অর্থ একদিক থেকে অতি গভীর ও অর্থব্যঞ্জক। যা হয় তো সে নিজেও প্রকৃত জ্ঞাত না। পুরুষের কাছ থেকে সে বীজ গ্রহণ করে। সেই বীজকে সে গর্ভে ধারণ করে, এবং নিজের রক্ত দিয়ে মাংসের মূর্তি তৈরি করে। তার শরীরের রক্তের প্লাবনের মধ্য দিয়েই, সেই মাংসের জীবটিকে পৃথিবীর মাটিতে জন্ম দেয়। রক্ত হলো জীবের আদি প্রবাহের ধারা। আর নারী তার নারীত্বের প্রথম দিনটি থেকেই, এই রক্তের সঙ্গে মাখামাখি করে আছে। রক্ত মাংসের এই প্রকৃতি লক্ষণের সঙ্গে, জড়িয়ে আছে তার প্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তি অন্ধ। স্নেহ প্রেমে বিগলিত হয়ে, এই প্রবৃত্তির প্রবাহে সে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে। বাঘিনীর মতো নির্দয় নিষ্ঠুরও হতে পারে। সমাজে এর শুভ দিকটাই প্রতিফলিত হয় বেশি। অশুভ দিকটা যখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখন সে ভয়ংকরী। প্রবৃত্তিকে সেই কারণেই মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে, চিরকাল ধরে একটা নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করছে

চেয়েছে। আর মানুষের বিশ্বজোড়া সভ্যতার বুকের ওপর এটাই বোধ হয় সব থেকে বড় সংকট, নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি কখনোই সে পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারে নি।

শংকর নিজের মধ্যে সেই প্রবৃত্তির তাড়না বোধ করে। তাকে নিঃশেষে নির্মূল করা সম্ভব না। তথাপি এই জাগতিক জীবনের অনুভূতি দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতেই হয়। সে ক্ষেত্রে, মল্লিকার প্রতি আরতির প্রশ্রয় ও সমর্থন, প্রবৃত্তি চালিত মূঢ়তা ছাড়া আব কিছু না। সংসারে সে বুদ্ধিমতী সজাগ দৃষ্টি গৃহিণী, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মল্লিকা আর শংকরের ক্ষেত্রে, সে নিতান্তই নারী প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত। নিজের সুখের কারণে, করুণাবশতঃ মল্লিকার প্রতি যদি এই সমবেদনার জন্ম হয়ে থাকে, তার একটা সীমারেখাও থাকতে হবে। অন্যথায় বিপর্যয়কেই টেনে আনা হবে। এ কথাটা মল্লিকাকেই হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। না করতে পারলে, শংকরকেও বিপর্যস্ত করে তোলা হবে।

সব মানুষ তার প্রার্থিত সকল শূন্যতাকে ভরিয়ে তুলতে পারবে, পৃথিবীতে এমনটি ঘটে না। অনেক শূন্যতাকে, তার বুকে রক্ত নিংড়ে পূর্ণ করতে হয়। তার আর কোনো গত্যন্তর নেই। শংকর এটাকে অমোঘ বলে জেনেছে। ও ব্যস্ত হয়ে, তক্তপোষ থেকে উঠে দাঁড়ালো, 'সেজবউদি, এমন দিন হয়তো আর কোনো দিন আসবে না। আজ আপনারা আমার অতিথি। অনেক দিন বলেছেন, আমি নিজের হাতে কেমন চা তৈরি করি, আপনাদের চেখে দেখার খুব ইচ্ছে। আজ আমি আপনাদের চা করে খাওয়াবো।'

আরতি তক্তপোষ থেকে লাফ দিয়ে নেমে বললো, 'রক্ষে করুন ভাই ঠাকুরপো, এই শরীর নিয়ে আপনি চা করবেন? আর আমরা তাই খাব?'

'কেন, আপত্তিটা কিসের?' শংকর হেসে বললো, 'যতোটা দুর্বল ভাবছেন ততোটা নই। জল গরম করে একটু চা করতে কোনো কষ্ট হবে না।' ও ঘরের একপাশে চলে গেল।

আরতি অবাক চোখে মল্লিকার দিকে তাকালো, 'চুপচাপ দাঁড়িয়ে

দেখছিস কি রে ন'?'

'কী করবো বলো সেজদি?' মল্লিকা উদাস স্বরে বললো, 'অসুস্থ বলে যাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে এলাম, তার কাছে আমরা এখন অতিথি। হার যখন মেনেছি, তখন এটুকুই বা বাকি থাকে কেন?'

আরতি ঝামটা দিয়ে বললো, 'মুখপুড়ি, তোর মুখে ছাই।' সে দ্রুত পায়ে শংকরের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, 'অসময়ে আমরা চা খাই না।'

শংকর বললো, 'চা খাবার আবার সময় অসময় আছে নাকি?'

'আপনার নেই, আমাদের আছে।' আরতি চোখের তারা ঘুরিয়ে বললো, 'অন্য কিছু থাকে তো বের করুন, গেলাস ভরে নিয়ে টানব।'

শংকর অবাক চোখে আরতির মুখের দিকে তাকালো। আরতি মল্লিকার দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো। মল্লিকা ঠোঁট টিপে হেসে বললো, 'সে বস্তু নিশ্চয়ই তোমার মাষ্টার ঠাকুরপোর ঘরে নেই।'

'সত্যি, এ লোক কোন কর্ম্মের নয়।' আরতি শংকরের বিভ্রান্ত জিজ্ঞাসু মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বাঁকালো, 'ঘরে একটু বিলিতি মদ রাখতে পারেন না? একটু না হয় নেশা করেই যেতাম।'

শংকর ভ্রূকুটি অবাক চোখে এক মুহূর্ত তাকিয়ে, হেসে উঠলো। আরতির মুখে মদ্যপানের প্রসঙ্গটি আগেও কয়েকবার শুনেছে। বিলিতি মদ বলতে, ভারতীয় ফরেন লিকার বলতে যা বোঝায়, তাই। ওর চোখের সামনে পানের আসর কোনো দিন চাটুয্যে বাড়িতে বসে নি বটে। তবে মনতোষ দেবতোষ, দুজনেই বাড়িতে মদ্যপান করে। আরতি আর মল্লিকার কথা থেকে, অনুমান করেছে, সেই আসরে, তাদেরও অংশ থাকে। আরতি নিজের মুখেই বলেছে, কালীপূজা বা বিশেষ বিশেষ দিনে, পানের মাত্রা বেশি হওয়ায় সে কয়েকবার মাতালও হয়েছে। বমি করে অসুস্থ হয়ে, স্বামী আর দেবরকে উদ্বিগ্ন ব্যতিব্যস্ত করেছে। তবে সে সব ঘটনা নিতান্তই অন্দরমহলের। বাইরের লোকের কতোটা অজানা, তাও স্থির করে বলা যায় না। অন্দরমহলে দাসী ভৃত্যের অভাব নেই।

শংকর বিব্রত হলো না, বিনীত হেসে কৌতুক করে বললো, 'সত্যি, আমি কোনো কর্মের নই। ও বস্তুটি আমার কাছে থাকে না।'

আরতি মদ্যাসক্ত না। শুচিবায়ু গ্রস্তও না। স্বামীর প্রশ্রয়েই কখনো সখনো খেয়ে থাকে। হিন্দু গৃহস্থ বধূ, তাও আবার গ্রামের অন্দরমহলে, বিষয়টি বিস্ময়কর বটে। অন্ততঃ শংকর যখন প্রথম শুনেছিল, বিশ্বাস করতে পারে নি। ওর নিজের একটা অতীত আছে। কলকাতার আরবান, মধ্যবিত্ত সমাজের চেহারাটা ওর ভালো জানা আছে। সেখানে মেয়েদের মদ্যপান ধূমপান কিছু অবাক হবার মতো ঘটনা না। গ্রামের শ্রমজীবি, দরিদ্র, নীচু জাত বলে যাদের পরিচয়, তাদের মদ খাওয়াও একটা অনায়াস অনাড়ম্বর বিষয়। অনেক মেয়েকেই মাতাল অবস্থায়ও দেখা যায়। কিন্তু গ্রামের কিছু পরিবারের বধূর মদ্যপানের সংবাদটা খুবই চমকপ্রদ লেগেছিল। পরে মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা এমন কিছু চমকপ্রদ না। বিস্ময়েরও না। এ ব্যাপারে শহর গ্রামের মধ্যবিত্তের নীতিবোধে খুব একটা ফারাক নেই। সংস্কার যেমন শহরে আছে, গ্রামেও তেমনি আছে। যাদের নেই, তাদের কোথাও নেই। কেবল চিত্রটা একটু ভিন্ন রকম।

আরতি বললো, 'এবার থেকে আনিয়ে রাখবেন। ব্যাটাছেলে একটু নেশাভাং করবে না, এ আবার কেমন কথা?'

'কথাটা ব্যাটাছেলে নিয়ে হয় নি। আমরা মেয়েছেলে।' মল্লিকা বলতে বলতে তক্তপোষের একপাশ দিয়ে, শংকরের কাছে এগিয়ে এলো, 'যান, আপনারা দুজনে গিয়ে বসুন, আমি সব দেখে শুনে চা করছি।'

শংকর ব্যস্ত হয়ে বললো, 'তুমি কী করে করবে? চা চিনি কোথায় কী সব আছে, তুমি জানো না।'

'না জানলে খুঁজে নিতে আমার অসুবিধে হবে না।' মল্লিকা নিচু হয়ে ধোয়া কেতলিটা তুলে নিল। ঢাকনা খুলে দেখলো। চোখ ফিরিয়ে জলের কুঁজোটা দেখে, সেদিকে গেল।

শংকরের দু'চোখ ভরা অসহায় অস্বস্তি। আর এ মুহূর্তে ওর নিজেকে দুর্বলও বোধ হলো। তাকালো আরতির দিকে।

আরতি হেসে, আবার অসংকোচে শংকরের একটা হাত টেনে ধরে বললো, 'আজ আপনার ঘরে ডাকিনী পড়েছে। আসুন, চুপচাপ বসুন। ন' চা করুক।' সে শংকরকে টেনে এনে তক্তপোষে বসিয়ে দিল।

শংকর বাইরে অন্ধকারে তাকালো। স্পষ্ট কিছু না দেখতে পেলেও, সেখানে যে ললিতা, গজাননের স্ত্রী এবং হয়তো আরও কেউ কেউ আড়াল থেকে এ ঘরের ঘটনা অতি কৌতূহলের সঙ্গে দেখছে, তা অনুমান করতে পারছে।

মল্লিকা ইতিমধ্যে অনায়াসেই চা চিনি গেলাস দুধ সব যোগাড় করে, স্টোভের সামনে জড়ো করেছে। সেখানে মাটির মেঝেয় বসে হাত বাড়িয়ে বললো, 'দেশলাইটা দিন।'

শংকর দেশলাইটা ছুঁড়ে ছিল। মল্লিকা এ ঘরের মাটির মেঝেয় বসে, স্টোভে চা করছে, এ দৃশ্য ওকেও অবাক করলো। কিন্তু এতে খুশি হওয়া যায় কী না, এ চিন্তাটাই একটা সংকটজনক প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল।

শংকর জানে, মল্লিকার চা করতে বসে যাওয়ার ব্যাপারে খুশি হওয়া যায় কী না, এ সংকটজনক প্রশ্নের নিরসন এখনই সম্ভব না। এ প্রশ্ন কতোটা ব্যাপক আর দুরধিগম্য, তার পরিমাপও এখনই সম্ভব না। অতএব, এ সংকটজনক প্রশ্ন নিয়ে আপাততঃ আর এক মানসিক সংকটে আবর্তিত হওয়া অর্থহীন।

মল্লিকা অনায়াসেই স্টোভ ধরিয়ে জল ভরা কেতলি বসিয়ে দিল। আরতি জিজ্ঞেস করলো, 'দেখতে পাচ্ছিস তো ন'?'

'পাচ্ছি।' মল্লিকা সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলো, 'কেন, তুমি কি ভাবছো, বিজলি বাতি ছাড়া আমি দেখতে পাইনে?'

আরতি শংকরের দিকে চোখের কোণে তাকিয়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলো। বললো, 'এ ঘর অন্ধকার হলেও তুই সব দেখতে পেতিস। ঘরের মাহাত্ম্য নাই?'

শংকর তক্তপোষ থেকে নেমে, হ্যারিকেনটা মল্লিকার দিকে এগিয়ে দিল, 'আমারই বোঝা উচিত ছিল, এত কম আলোয় তোমার অসুবিধে

হবে। এ কষ্ট করার কোনো দরকার ছিল না, কিন্তু—।'

শংকর কথা শেষ না করে, এক রকম অসহায় ভাবে হাসলো। মল্লিকা বললো, 'ওই কিন্তু পর্যন্তই থাক। চা তো আপনাকে এই প্রথম খাওয়াচ্ছি না। আজকের খাওয়ানোটা অবিশ্যি অন্য রকম। আমাদের নিজেদের খাওয়াটাও। তবু একটু একঘেয়েমি কাটলো।'

'পা যখন বাড়িয়েছিস ন', মাঝে মাঝে এসে এ রকম খাইয়ে যাস।' আরতি শংকরের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলো। মল্লিকার দিকে তাকিয়ে চোখের তারা ঘুরিয়ে বললো, 'আর নিজেও খেয়ে যাস।'

মল্লিকা হেসে বললো, 'পা কতোটা বাড়ানো যায়, তার হিসেব কষা বড় কঠিন সেজদি। তবে যদি উপায় থাকে তোমার সঙ্গেই আসবো।'

'আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন?' আরতি কপট মুখ ঝামটা দিল। নাকছাবিতে ঝিলিক দিয়ে, তৎক্ষণাৎ আবার নিশ্বাস ফেলে বললো, 'যেখানে আমার ভাগ নেই, সেখানে ভাগ বসাতে চাইনে। আর সাক্ষীই বা থাকতে যাব কোন্ দুঃখে।'

মল্লিকা সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে, শংকরের মুখের দিকে দিকে একবার দেখলো। তারপর স্টোভের দিকে ফিরে, ফুটে ওঠা জলের কেতলী আঁচল দিয়ে ধরে নামালো।

মল্লিকার এই শাড়ির আঁচল্ দিয়ে ধরে কেতলি নামানোর আটপৌরে ভঙ্গিটি শংকরকে অবাক করলো। উদ্বেগও বোধ করছিল। এ সব দরিদ্র গৃহস্থ বউ ঝিদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু মেয়েরা কখন কোন্ পরিস্থিতিতে যে কী করতে পারে, তা সহজে বুঝে ওঠা যায় না। তবু তাঁতের নীল শাড়ির ওপরে, লাল পশমী শাল যে ভাবে মেঝের ওপর এলিয়ে পড়েছে, আর মল্লিকার নড়াচড়ায় স্টোভের আগুনের শিখার সামনে আঁচল আর শাল মাঝে মাঝেই ঝাপটা খাচ্ছে, উদ্বেগ বোধ না করে পারছে না। ও বললো, 'মল্লিকা, এবার তুমি উঠে এসো, বাকিটা আমি করছি।'

'আপনি বরং সেজদির সঙ্গে কথা বলুন।' মল্লিকা আঁচল দিয়ে

ধরেই কেতলির ঢাকনা খুলে, চায়ের পাতা ঢেলে দিল। তারপর কেতলির মুখ বন্ধ করে বললো, 'আপনার এত ভয়টা কিসের? আমরা কি বাড়িতে হাত-পা গুটিয়ে পটের বিবি সেজে বসে থাকি?' সে ঢাকনা দেওয়া দুধের বাটি স্টোভের ওপর বসিয়ে দিল।

আরতি ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, 'আমার সঙ্গে কথা আর কী আছে ন'? মাস্টার ঠাকুরপো নিশ্চিন্তে বসতেও পারছে না। তার চেয়ে বরং তোর কাছে নিয়ে বসা, তাতেই উনি স্বস্তি পাবেন।'

শংকর বিব্রত হেসে আরতির দিকে তাকালো। আরতির মুখ তো সব সময় খোলাই আছে। এখানে এসে আজ মল্লিকার মুখও যেন কিঞ্চিৎ বেশি আগল খোলা। শংকর আরতির কাছে গিয়ে, তক্তপোষের ওপর বসলো। ও জানে, এই দুই রমণীর কথাবার্তার মুখ্য ভূমিকা হয়তো ওরই, কিন্তু বলার কিছু নেই। তবু বললো, 'আমার ভয়টা আগুনের। দেখছেন তো, আপনার জা' জলন্ত স্টোভের সামনে কী ভাবে লাল শাড়ি ছড়িয়ে বসেছে।'

'সেই ভয় পাচ্ছেন মাস্টার ঠাকুরপো!' আরতির কৌতুক ঝলকানো চোখ বড় হয়ে উঠলো। শংকরের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'ও তো মরেইছে, না হয় এবার আগুনে পুড়বে। মরলে তো আগুনেই পোড়াতে হয়, জানেন না?'

শংকর এ কথারও জবাব দিতে পারে না। এ পরিহাসের জবাব ওর জানা নেই, এবং জবাবের প্রত্যাশাও নিশ্চয় আরতির নেই। মল্লিকা ইতিমধ্যে দুধের বাটি নামিয়ে, স্টোভ নিভিয়ে দিয়েছে। কেরোসিনের ধোঁয়ার গন্ধে ঘর ভরা। ও গেলাসে গেলাসে চিনি দিয়ে, কেতলি থেকে চা ঢালতে ঢালতে বললো, 'তা বলে, এ ঘরটাকে আমার শ্মশান করতে চেও না সেজদি। একটু আগে যে তুমি বলছিলে, এ ঘরের মাহাত্ম্য আলাদা?'

'বালাই ষাট, এ ঘর কেন শ্মশান হবে?' আরতি শংকরের দিকে চোখ রেখেই বললো, 'গায়ে তোর আগুন লাগলে, ঘরের বাইরে ফেলে দিয়ে আসব।'

মল্লিকা চা ভরা দুটি ধূমায়িত গেলাস দু হাতে নিয়ে এগিয়ে

এলো। ডান হাতের গেলাসটা আগে শংকরের দিকে বাড়িয়ে দিল। শংকর গেলাস নিল। মল্লিকা আর একটা গেলাস ডান হাতে নিয়ে আরতির দিকে বাড়ালো। আরতি গেলাস নেবার আগে, মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ন', এই মাঘের শীতেও তোর নাকের ডগায় চিবুকে ঘামে জেল্লা দিচ্ছে। মুখখানি যে তোর এত সুন্দর, আগে যেন কখনো দেখি নি!' ঘাম তেল মাখা প্রতিমার মতন।'

মল্লিকার মুখে লাল ছটা লেগে গেল। চকিতে একবার শংকরের দিকে দেখলো, আর ছটা লাগা মুখে সহসাই যেন কেমন একটা বিষণ্ণ ছায়া নেমে এলো। বললে, 'গেলাসটা নাও সেজদি।'

আরতি চায়ের গেলাস নিল। মল্লিকা গায়ের থেকে শালটা খুলে, কাঁধের ওপর-ঝুলিয়ে নিল। সরে গেল স্টোভের দিকে। নিজের গেলাসটা হাতে নিয়ে, মুখ না ফিরিয়ে বললো, 'বিসর্জনের বাজনা বেজে উঠতেই যা দেরি।'

'সে কথা ভেবে বলি নি রে মুখপুড়ি। আরতি মল্লিকার দিক থেকে চাখ ফিরিয়ে শংকরের দিকে তাকালো, 'তোর রূপের কথা বলেছি। মেয়েদের রূপ এমনিতে ছ্যাখতাই যেমনই হোক, সময়ে তার আর এক রকম খোল্‌তাই হয়। তোর সেই খোল্‌তাই রূপটাই দেখলাম।'

আবতি মন্তব্য করে, অথচ তার চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি শংকরের দিকে। কিন্তু শংকর জানে, আরতির ওর কাছ থেকে কিছু শোনার প্রত্যাশা নেই। রমণী হৃদয়ের এও এক মনের খেলা। বস্তুত, তার কথার উদ্দিষ্ট মানুষ শংকর, এবং শংকরের প্রতিক্রিয়া তার লক্ষ্যের বিষয়।

শংকর চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'চমৎকার!'

মল্লিকা আর আরতি পরস্পরের সঙ্গে চোখাচোখি করলো। আরতি মুখ টিপে হেসে শংকরকে জিজ্ঞেস করলো, 'আগে বুঝি কখনো ওর হাতে এমন চমৎকার চা খান নি?'

'অনেকবার খেয়েছি।' শংকর হেসে বললো, 'কিন্তু এ ঘরের চা আর আপনাদের বাড়ির চা তো এক রকম না তবু তৈরির গুণে চমৎকার।'

আরতি শংকরের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'প্রাণ খুলে বলুন না বিশেষ হাতের গুণে চমৎকার! আমি কিছু মনে করব না। বর গুণের হাতটি নিয়ে যদি একটু সোহাগ করতে চান, তাও করতে পারেন।'

'চুপ কর সেজদি।' মল্লিকা শংকরের দিকে একবার দেখে নিল, 'মানুষকে অকারণ অস্বস্তিতে ফেলো না।' ও চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে, গেলাস নামিয়ে রাখলো। চা চিনির কৌটো আর দুধের বাটি যথাস্থানে তুলে রাখলো।

শংকর বললো, 'ওগুলো তোমায় না করলেও চলতো। এর পরে যেন গেলাসগুলো ধোবার চেষ্টা করো না।'

'তা বললে তো হয় না মাস্টার ঠাকুরপো।' আরতি চোখের ভঙ্গি করে বললো, 'সব কাজেরই শুরু আর শেষ আছে। কোনো কাজই আধাখ্যাচড়া করে ফেলে রাখা যায় না।'

শংকর জানে এখানে তর্ক প্রতিবাদ সবই বৃথা। তবু বললো, 'চাটুয্যে বাড়ির বউয়েরা এ ঘরের এঁটো গেলাস ধোবে, সেটা লোকে দেখলেই বা কী বলবে? আমারও তো একটা নজর বলে কথা আছে। আপনারা এ ঘরে এসেছেন, নিজের হাতে চা করে খাইয়েছেন, সেটাই অনেকখানি। যা নিজের বাড়িতে করেন না, তা এখানেও করতে হবে না।'

এই সময়ে দরজার বাইরে থেকে হরির গলা শোনা গেল, 'গেলাস আমি ধুয়ে দুব গ মায়েরা। উয়ার লেগ্যে ভাবতে হবেক নাই।'

ঘরে মধ্যে তিনজনেই চমকে উঠলো। বিশেষ করে আরতি আর মল্লিকার চমকিত বিস্ময় দেখে বোঝা গেল, তারা তিন ছাড়াও যে কাছে পিঠে আরও লোক থাকতে পারে, সেটা তারা বিস্মৃত হয়েছিল। কিন্তু শংকর যেন লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল। প্রায় আহত বিস্ময়ে বলে উঠলো, 'ইস্, হরি যে বাইরে বসে আছে, সেটা খেয়ালই ছিল না। আমরা দিব্যি ঘরে বসে চা খাচ্ছি।'

'তা উয়াতে কী হইচে গ মাস্টারবাবু।' হরির নিরীহ স্বরে সম্ভ্রমের সুর, 'আপনাদিগের সঙ্গে আমাকে ক্যানে চা খাইতে হবেক? আর ই

সময়তে আমি চা খাই না, মায়েরা জানেন।'

আরতি চায়ের শূন্য গেলাস তক্তপোষের ওপর রেখে, ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আমাদেরও যাবার সময় হল, আর দেরি করা যায় না। কিন্তু ন' তুই যে বলছিলি, মাস্টারঠাকুরপোকে খাইয়ে যাবি?'

'দোহাই সেজ বউদি।' শংকর গেলাসশুদ্ধ, দু'হাত জোড় করে, তক্তপোষ থেকে নেমে দাঁড়ালো, 'ওটি আর করতে যাবেন না। এই মাত্র চা খেলাম। ঠিক মতো আমি খাবার খেয়ে নেবো।'

হরি ঘরে মধ্যে ঢুকে এলো, 'কই, গেলাসগুলান দেখি, ধুয়ে লিয়ে আসি।'

'না, তার দরকার হবে না হরি।' শংকর স্পষ্ট বাধা দিয়ে বললো, 'তুমি তো জানোই, রাত পোহালেই রুকুবুড়ি আসবে। এখন যা যেমন আছে, তেমনই থাকুক. সকালে ধোয়াধুয়ি হবে।'

মল্লিকা আর আরতি পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলো। মল্লিকা শূন্য গেলাস মেঝেয় নামিয়ে, এগিয়ে এসে শংকরকে বললো, 'তাহলে দুধটা গরম করে নেবেন। এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। টিফিন কেরিয়ারের বাটিতে কিছু পাতলা সুজি আছে।' ও আরতির দিকে ফিরে তাকালো।

আরতি ইতিমধ্যে কালো শালটি গায়ে জড়িয়ে, মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়েছে। বললো, 'সামনে বসে খাইয়ে যেত পারলি নে বলে, আমাকে দোষ দিস নি যেন ন'। চায়ের পাট করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। এর পরে হয়তো তোর সেজদা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসবে।'

'সামনে বসে চা তো খাওয়া হয়েছে।' শংকর হেসে বললো, 'সেজদা যদি সত্যি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন, সে ভারি বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। আপনারা বেরিয়ে পড়ুন।'

আরতি হাত তুলে, ভ্রূ কুঁচকে বললো, 'ওরকম্ তাড়া দেবেন না তো। যাবার কথা তো নিজের মুখ ফুটেই বলেছি।' মল্লিকার দিকে ফিরে বললো, 'ও রকম বোবা হাবার মতন তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকিস না ন'। মাথায় ঘোমটা দে, শালটা গায়ে জড়া।'

মল্লিকা দ্রুত হাতে আরতির নির্দেশ পালন করলো। শংকরের

দিকে একবার দেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আরতি পা বাড়াবার আগে বললো, 'কাল কী হয় দেখি।'

হরি দরজার বাইরে গিয়ে হ্যারিকেন হাতে তুলে নিল। মল্লিকা আর একবার শংকরের দিকে তাকিয়ে পিছন ফিরে ঘরের বাইরে চলে গেল। আরতি তখন ঘরের বাইরে, তার স্বর শোনা গেল, 'আপনি আর বাইরে আসবেন না।'

শংকরের মনে হলো, দুজনের আসাটা যেমন একটা চমক লাগানো ঝলকের মতো লেগেছিল, বিদায়ের মুহূর্তটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। মল্লিকা বা আরতির কারোর মুখেই হাসির ছোঁয়া আর রইলো না। যদিও আরতি আগামীকালের বিষয়ে একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিতও দিয়ে গেল। যার অর্থ, আগামীকাল রাতেও এখানে হানা দিতে পারে। তবু পরিহাসের সেই প্রসন্নতা ছিল না যাবার মুহূর্তে। ও ঘরের ভিতর থেকেই দেখলো, ডাঙা আটচালার পাশ দিয়ে আরতি আর মল্লিকার ছায়ার মতো শরীর আড়ালে চলে গেল। সেই সঙ্গে আলোও অদৃশ্য। কিন্তু অন্ধকারে অস্পষ্ট কয়েকটি ছায়াকে আটচালার উঠোনের সামনে জড়ো হতে দেখা গেল।

প্রথম পর্বের সমাপ্ত